বিষণ্ন বেহাগ

এক.

লিজি সাধারণত কারো ব্যাপারে কৌতূহল দেখায় না। বিশেষ করে কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার জানার ওর কৌতূহল নেই। ওর মধ্যে কৌতুহল বোধ কম। ও বড় হয়েছে নিউইয়র্কে। নিউইয়র্কে বড় হয়েছে বলেই হয়তো ওর মধ্যে আমেরিকানদের চারিত্রিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমেরিকানরা কারো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কৌতুহল দেখায় না। বাংলাদেশের লোকেরা ঠিক এর উল্টো। বাংলাদেশের সবার মধ্যে তীব্র কৌতুহল। কে কী করলো, কার চরিত্র কেমন, কার বদ অভ্যাসগুলো কী-এ সব নিয়ে অনেকে আলোচনা করতে পছন্দ করে। অন্তত লিজির তাই ধারণা। ও যতবার বাংলাদেশে এসেছে, ততবার ওকে পরিচিতজনের নানা রকম কৌতুহলী প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। ওর বিয়ে কেন হয়নি, বা হচ্ছে না-এই প্রশ্নের জবাব এ পর্যন্ত ওকে দিতে হয়েছে অনেকবার। হয়তো আরো দিতে হবে। ও এটা জানে। যে লিজি কারো ব্যাপারে কৌতুহল প্রকাশ করে না, সে এবার বাংলাদেশে এসে হঠাৎ করে একজনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কৌতুহলী হয়ে ওঠেছে। এই কৌতুহল সৃষ্টির যথেষ্ট কারণও আছে। যাকে নিয়ে ওর এই কৌতুহল, তার নাম আবিদ। আবিদের আচরণ রহস্যজনক। তার অদ্ভুত আচরণ ওর মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি করেছে। আবিদ ভাতসাইল গ্রামের একটি নৈশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই অজপাড়া গাঁয়ে সে স্কুল নিয়ে পড়ে আছে। এই স্কুলটি খুলেছে লিজির মামা আকরাম চৌধুরী। ওর মামা চাকসাইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। গ্রামের কৃষক, দিনমজুর বা কর্মজীবী নিরক্ষর মানুষদের রাতের বেলায় স্বাক্ষরতা জ্ঞান দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি এই নৈশ স্কুল খুলেছেন। আবিদ এই স্কুলের একমাত্র শিক্ষক। গ্রামে বেড়াতে এসে এই স্কুলে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছে লিজি। ওর স্কুলে যোগ দেবার গুরুত্বপূর্ণ কারণও রয়েছে। ও নিউইয়র্কে একটি কলেজে পিএইচডি করছে। ওর পিএইচডি'র বিষয় হচ্ছে 'তৃতীয় বিশ্বের গ্রামীণ জনজীবন'। উন্নত বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বের নানা বিষয় নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়। সামার ভেকেশনে এসে লিজি মামার বাড়িতে থেকে বোঝার চেষ্টা করছে গ্রামীণ জনজীবনের প্রকৃত চিত্র কী রকম। বলা যায় ও এবার গ্রামে এসে প্রাকটিক্যাল ক্লাস করছে। অনেকটা হাতে-কলমে শেখার মতো। ওর মামার বাড়ি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকায়। এখানকার গ্রামগুলো ঘুরে ও থিসিস তৈরি করতে চায়। তাই লিজি গ্রামে এসেই যোগ দেয় ওর মামার গড়া নৈশ স্কুলে, শিক্ষিকা হিসাবে। স্কুলে যোগ দিয়েই ওর মনে হয়, গাঁয়ের অতি সাধারণ লোকদের স্বাক্ষরতা দানের মধ্য দিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা লাভ করতে যাচ্ছে ও।

লিজি চাকসাইল ও ভাতসাইল গ্রামে আগেও এসেছে। তখন গ্রামের মানুষ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এবার গ্রামে বেড়াতে এসে ও এই প্রথম সবকিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

গ্রামে ঘুরে লোকদের সঙ্গে মিশে ওর মনে হয়েছে গাঁয়ের লোকেদের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের নিরন্তর সরলতা। তাদের এই সরলতা সবসময় প্রকটভাবে ফুটে থাকে, শান্ত পুকুরে পদ্ম ফুটে থাকার মত। সামগ্রিক বিষয়ে গ্রামের লোকগুলোর অজ্ঞতা রয়েছে, অথচ এই অজ্ঞতার জন্য তারা মোটেও বিব্রতবোধ করে না। তাদের জীবন দর্শন সাটামাটা। বেঁচে থাকার জন্য তারা প্রতিদিন সংগ্রাম করে। দারিদ্রতার সঙ্গে তাদের লড়াই আর দৈনন্দিন টানাপোড়নে তারা অভ্যস্থ। প্রতিনিয়ত তাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়। কিন্তু তারা এতে মুষড়ে পড়ে না। বরং কখনো কখনো তারা স্বপ্নহীন পথ চলে। আবার একটু কিছু প্রাপ্তিতেই তারা সীমাহীন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। পৃথিবীর কোথায় কী ঘটলো, কোথায় যুদ্ধের দামামা বাজলো বা কোথায় নতুন কিছু আবিষ্কারের ডামাডোল হচ্ছে, সে খবর তারা রাখে না। বা রাখতে পারে না। অনেক সময় তারা এ সব জানতে পারে না, বা জানতে চায় না। ঘটনাক্রমে এ ধরনের খবর তাদের কানে এসে পৌঁছুলেও এ সব খবর তাদের স্পর্শ করে না। গ্রামের মানুষ নিয়ে লিজির ধারণা হয়েছে ও রকম। গ্রামের লোকদের নির্মোহ জীবনযাপন লিজিকে ভীষণ অবাক করে। অবশ্য ওর মা ওকে বলেছেন যে, গ্রামে কুটিল বুদ্ধিসম্পন্ন হিংস্র এবং পরশ্রীকাতর শ্রেণীর লোকও রয়েছে। তারা সর্বক্ষণ অপরের অমঙ্গল কামনা করে এবং নির্দয়ভাবে অন্যের ক্ষতি সাধন করে। চাকসাইল ও ভাতসাইল গ্রামে ঘুরে লিজি এ ধরনের লোক এখনো দেখতে পায়নি। হয়তো তারা আছে, লিজি তাদের দেখা পাচ্ছে না। ওর মা এই গ্রামেরই মেয়ে। নিজের গ্রামের লোকদের চরিত্রের একটা ধারণা নিশ্চয় তার আছে। মাঝেমাঝে এ কথাও ভাবে লিজি।

লিজি গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশে বুঝতে পেরেছে তাদের প্রায় সকলে আবিদকে খুব সম্মান করে। ও বিভিন্ন সময় অনেকের সঙ্গে আবিদের ব্যাপারে কথা বলে দেখেছে, আবিদকে তারা ‘পাগল’ বলে মনে করে। আবার তাকে খুব পছন্দও করে। লিজির ধারণা, আবিদ ইচ্ছে করে নিজের পাগলামী একটা চরিত্র নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। ও নিশ্চিত, আবিদ পাগল নয়। সে পাগলের ভান করে থাকে। কখনো কখনো সে ইচ্ছে করে অস্বাভাবিক আচরণ করে, যা দেখে অনেকে তাকে পাগল ভেবে নেয়। অনেক লোক আছে, যারা ভান করে থাকতে পছন্দ করে। কেউ আছে নিজেকে রহস্যের মধ্যে রাখতে আনন্দ পায়। কেউবা নানা কারণে নিজেদের আড়াল করে রাখতে চায়। এ ধরনের রহস্য শিল্পীও করতে পারে, খুনিও করতে পারে। লিজির ধারণা, আবিদ খুনি-টুনি কেউ হবে। আবিদকে নিয়ে লিজির প্রথম থেকেই এ রকম সন্দেহ। সন্দেহ থেকেই কৌতুহলের সৃষ্টি। লিজি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছে, আবিদ সব সময় নিজেকে সবার কাছ থেকে সযত্নে আড়াল করে রাখে। কারো সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। কারো সঙ্গে মেশে না। এমনকি কারো মুখের দিকে তাকায়ও না। এমন নির্লিপ্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কারো হতে পারে না। এটা আবিদের নিজের মধ্যে নিজেরই আরোপিত চরিত্র। খুব নিখুঁতভাবে কৃত্রিম নির্লিপ্ততাকে সে নিজের মধ্যে ধরে রেখেছে। লিজি প্রথম প্রথম আবিদের রহস্যময় চরিত্র নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি। ও ধরে নিয়েছিল, আবিদ একজন নিষ্ঠুর শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক এবং অহংকারী মানুষ। কিন্তু

যতই দিন যাচ্ছে, আবিদের ভেতরের অন্য এক সত্ত্বার সন্ধান পাচ্ছে লিজি। ধরা যাক কালকের কথা। কাল আবিদ স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে শেষ বিকেলে দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিল তন্ময়ভাবে। লিজি আবিদকে এমন তন্ময় হয়ে থাকতে দেখেনি। ও স্কুলঘর থেকে বের হয়ে আবিদের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশে ওর কাছে এসে শান্ত গলায় বললো,
'যারা এভাবে মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে, তারা এমন অহংকারী হয় কিভাবে!'
শান্ত পুকুরে হঠাৎ ঢিল ছুড়ে মৃদু ঢেউ তোলার মত প্রশ্ন। প্রশ্নটা করে লিজি ভেবেছিল আবিদ তার আরোপিত স্বভাব অনুযায়ী এ প্রশ্নের জবাব দেবে না। কিন্তু লিজিকে অবাক করে দিয়ে আবিদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
'প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব অহংকার থাকা উচিত!'
আবিদ কথাটি বললো নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার মত করে। লিজি সময় নষ্ট না করে কণ্ঠে বিস্ময় তুলে বললো,
'কেন!'
এক ধরনের তন্ময়তার মধ্যে আবিদ বললো,
'অহংকার হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বের দ্যুতি।'
'তাই নাকি! যারা নিরংকারী, তবে তারা কি? তাদের কি ব্যক্তিত্ব নেই?'
'আমার কাছে অহংকারহীন মানুষকে ছাপোষা প্রাণী বলে মনে হয়। তারা বেঁচে থাকে শুধু। এই বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে তারা জীবনটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। এক সময় মরে যায়। এই দ্যুতিহীন জীবন কী দিতে পারে সমাজকে, এই পৃথিবীকে?।'
আবিদের প্রশ্নটা ভালো লাগলো লিজির। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর চট করে দেয়া যায় না। অনেক সময় বুঝে ওঠাও যায় না। লিজি তর্ক করার ভঙ্গিতে বললো,
'আপনার দৃষ্টিতে যারা দ্যুতিহীন, তারা বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে কি জীবনকে উপভোগ করছে না?'
দিগন্তে মুখ রেখেই আবিদ বললো,
'যারা বৈষয়িক এবং বিত্ত-বৈভব হাতড়ে বেড়ায়, যারা প্রাপ্তিটাকেই জীবনের বড় অর্জন বলে মনে করে, তারা সময়কে উপভোগ করে, জীবনকে নয়।'
'কী রকম?'
'তারা আসলে জীবনটাকে চেনে না। বিশেষ বিশেষ সময়ে তারা ভোগ বিলাসিতায় মত্ত হয়ে জীবনের স্বার্থকতা খোঁজে। আমি মনে করি,তারা জীবনের জানান দিতে পারে না। যাপনের শুদ্ধতা বোঝে না। তারা কখনো সৃষ্টির মহত্ব খোঁজে না। তারা এক ধরনের অন্ধ, পথভ্রষ্ট!'
আবিদ যেন অন্যলোকে হারিয়ে গেছে। কথা বলছে দিগন্তের দিকে চেয়ে। এমনভাবে কথা বলছে, যেন বাণী আওড়াচ্ছে। লিজি তাকে থামাতে চায় না। ও বললো,
'আর!'

‘তারা অন্ধের মত স্রষ্টার বন্দনা করে। তারা স্রষ্টার সন্ধান করতে জানে না। তারা সৃষ্টিশীলতা, শিল্পময়তা বা নান্দনিকতা বোঝে কিনা-কে জানে! তারা আটপৌড়ে জীবনের সীমারেখায় বন্দি হয়ে থাকে।’
‘এক্সিলেন্ট! তারপর..! আরেকটু বলুন, প্লিজ!’
লিজির আকুতি আবিদ শুনতে পেল না যেন। সে তন্ময়তার মধ্যে বললো,
‘আর যে জীবনের মহত্ব নিয়ে ভাবে, যে জীবনের সীমারেখা ভেঙে চলে, যে এক তুমুল স্বপ্ন থেকে হাজার স্বপ্নের অনুরণন তোলে-সেই তো জীবন বোধে সংগ্রামী মানুষ হয়। আর তখুনি তার মধ্যে জন্ম নেয় এক ধরনের অহংকার।’
‘বেশ তো! বলে যান, প্লিজ!’
‘এই অহংকার হাত পেতে পাওয়া যায় না। এটি কোন স্বপ্নে পাওয়া অলৌকিক কিছুও নয়। এটা অর্জন করতে হয়। তাই আমাকে যদি অহংকারী বলেন, তবে আমি বলবো-এই অহংকার আমি অর্জন করেছি।’
কথার জলপ্রপাত যেন নামলো। কথায় কথায় কেমন মুগ্ধ হয়ে গেল লিজি। আবিদ তাহলে অতটা অজ্ঞ নয়। অজ্ঞতার ভান করে থাকে। এটাও তো এক ধরনের কপটতা, বুঝতে পারলো লিজি। আবিদ দিগন্তের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে লিজির মুখোমুখি হল। দৃষ্টি অবনত। লিজি মুগ্ধকণ্ঠে বললো,
‘আমি এমন কথা কখনো শুনিনি!’
হঠাৎ আবিদের যেন তন্ময়তা ভেঙে গেল। ও চুপ মেরে গেল। কিন্তু লিজি নাছোড়বান্দা। ও চায় আবিদ কথা বলুক। কথা বললে মানুষ তার স্বরূপ গোপন করে রাখতে পারে না। কথা বললে নিজের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। লিজি আবিদকে উস্কে দিতে বললো,
‘আপনি যা বললেন, তা কখনো আমি শুনিনি। বা আমাকে এমন করে কেউ বলেনি!’
আবিদ লিজির এ কথায় বিরুক্তি প্রকাশ করে বললো,
‘সব কথা সবাইকে শুনতে হবে, এ ধারণা ঠিক নয়।’
এ কথায় লিজির মাথায় রাগ চেপে যাওয়ার কথা। অন্য সময় বা অন্য কেউ এমন কথা বললে ও রেগে যেত। ও নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,
‘তা ঠিক, সব কথা সবাই জানবে, এমন হতে পারে না। কিন্তু আপনার কথাই যে সত্যি, তা কেন বিশ্বাস করবো?’
আবিদ এর কোন জবাব দিল না। ও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। লিজি ফের বললো,
‘কি হলো, আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন না?’
‘আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না।’
আবিদ বিরক্ত গলায় বললো। লিজি তাগিদ দেবার মত করে বললো,
‘কিন্তু আমার জানতে হবে, কেন আপনার কথা বিশ্বাস করবো। আপনাকে তা বলতে হবে।’
‘জোর কথা বের করা হয়তো যায়, কিন্তু বিশ্বাস জোর করে হয়না। আমার কথাকে আপনাকে বিশ্বাস করতে কে বলেছে? আপনি বিশ্বাস করতে না চাইলে, করবেন না। ব্যাস!’

বললো আবিদ। লিজি বললো,
'আপনার কথাগুলো সুন্দর। তবে যুক্তি নির্ভর কিনা বুঝতে পারছি না। তবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। তাই আপনার কাছ থেকে এ কথাগুলোর যুক্তিও খুঁজছি।'
আবিদ ফের ঘুরে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইলো। ও লিজির এ প্রশ্নের জবাব দিতে চায় না। লিজিকে সে উপেক্ষা করছে, সেটা সে জানান দিতে চায়। লিজি বললো,
'আপনি কি কিছুই বলবেন না?'
এর কোন জবাব দিল না আবিদ। ও লিজির প্রশ্নকে উপেক্ষা করে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইলো। লিজির রাগ বাড়তে লাগলো। ও এবার রাগী গলায় বললো,
'আপনি ভাবছেন আপনার দাম্ভিকতা আপনার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করছে? আপনি কি জানেন, অহংকার করার মত আপনার কিছু নেই? অন্তত আমি আপনার মধ্যে এমন কিছু দেখছি না।'
আবিদ লিজির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। দিগন্তের দিকে মুখ রেখে ও বিনয়ী গলায় বললো,
'আমি কি বলেছি যে, অহংকার করার মত আমার কিছু আছে? আপনি কেন আমার মধ্যে ওসব খুঁজতে যান?'
'আমি আপনার মধ্যে ও সব খুঁজতে যাবো কেন? আপনার অজ্ঞতা দেখে আমার আফসোস হচ্ছে!'
আবিদ চুপ করে রইলো। লিজির ভেতরে একটা প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ও ফের বললো,
'আপনি কি শুনেছেন যে, আপনার অজ্ঞতা দেখে আমার আফসোস হচ্ছে?'
আবিদ এবার একটু হাসলো। ও বললো,
'আমার দুর্ভাগ্য যে, আপনার আফসোসের কারণ হয়েছি।'
লিজি ভীষণ অপমান বোধ করলো এ কথায়। ও বললো,
'আপনি একটা ইডিয়েট!'
এ কথা বলে লিজি রাগে কাঁপতে লাগলো। আবিদ ওর রাগকে গায়ে না মাখার ভাব করে বললো,
'আপনি অকারণে আমার উপর রাগছেন। আমাকে বা আমার কথাকে অতোটা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? আমার কোন গুরুত্ব নেই। আমার কথারও গুরুত্ব নেই।'
'আপনি ভীষণ সিলি ক্যারেক্টরের লোক। আপনাকে গুরুত্ব দেবার মত রুচি আমার নেই।'
'শুনে ভালো লাগলো।'
'আপনার ভালোলাগা বা মন্দলাগাতেও আমার কোন কিছু যায় আসে না।'
'আর কিছু বলবেন?'
'না। আপনি আমার সামনে থেকে যান,প্লিজ!'
আবিদ আর কোন কথা বললো না। ও নিঃশব্দে চলে গেল। ও লিজির দিকে ফিরে তাকালো না। লিজি রাগের উত্তাপে কাঁপতে লাগলো। এ রকম রাগ ওর কখনো হয়নি। ওর দু' চোখ

গড়িয়ে অশ্রুধারা নেমে এলো। রাগলেই ওর কান্না পেয়ে যায়। এখনো তাই হলো। টপটপ করে ওর দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ে পড়ছে। এক সময় লিজি মনে মনে এই অশ্রুধারার নাম দিল 'অপমান'।

দুই.

বাস থেকে নেমে ভীষণ অবাক হলো রাহাত। চাকসাইলের চেহারাই যেন বদলে গেছে। ও চিনতে পারছিল না। মাত্র ছয় বছরে একটি গ্রাম এমন বদলে যেতে পারে, তা ও কল্পনাও করেনি। চারপাশে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে রাহাত ভাবলো চাকসাইলকে এখন আর গ্রাম বলা যাবে না। ছোট একটি উপশহর বলা যায় । ও এই চাকসাইলকে অজপাড়া গাঁ হিসেবে দেখে ঢাকা গিয়েছিল। ছয় বছর পর এসে দেখলো চাকসাইল এখন ব্যস্ত জনপদে পরিণত হয়েছে। রাহাত ঢাকায় থাকতে শুনেছে চাকসাইল ভাতসাইলসহ আশেপাশের গ্রামগুলো একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। এখানে আর গরুর গাড়ির চলাচল নেই। চাকসাইলে পাকা রাস্তা হয়েছে। নগর জীবনের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে এ সব গ্রামে। বাস এসে থামছে এখানে। রাস্তার দু'পাশে এখানে সেখানে খোলা হচ্ছে দোকানপাট। চাকসাইলে মানুষের জটলা, হৈ হুল্লোড় যখন-তখন লেগেই থাকে বলে ও শুনেছে। আজ চাকসাইলে বাস থেকে নেমে কথাটি সত্যি মনে হলো ওর। যদিও এই মুহূর্তে রাস্তা ফাঁকা। কিন্তু বাস স্ট্যান্ড থেকে নামার পর ও অচেনা লোকজনের ব্যস্ত ছুটোছুটি ও হৈ-হুল্লোড় দেখেছে। লোকগুলো কোথাও যেন দ্রুত মিলিয়ে গেল। গ্রামে অচেনা লোক খুব একটা দেখা যায় না। রাহাতের বাড়ি চাকসাইলের পাশের গ্রাম ভাতসাইলে। শহরে যেতে হলে ভাতসাইলের সকলকে চাকসাইল হয়েই যেতে হয়। আজ ছয় বছর পর গ্রামে ফিরে চাকসাইলের পরিবর্তন দেখে রাহাত অবাক না হয়ে পারলো না। ও বেশি অবাক হলো, যখন দেখলো রাস্তার পাশে টপস ও স্কার্ট পরিহিত এক তরুণী চেইন খুলে যাওয়া সাইকেল নিয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটির গায়ে লাল রঙের টপস। টপসের গলায় নকশী আঁকা সুতার কাজ। সাদা স্কার্টের উপর টপসটি বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। এখানে টপস ও স্কার্ট পরিহিতি কোন মেয়ে দেখবে রাহাত কখনো কল্পনাও করেনি। মেয়েটি চারপাশে তাকিয়ে কেউ সাহায্য করতে পারে, এমন কাউকে খুঁজছে। চাকসাইল বা ভাতসাইলের মেয়েরা হঠাৎ করে কোন মন্ত্র বলে আধুনিক হয়ে গেল কি? প্রশ্নটা রাহাতের মনে কিছুক্ষণের জন্য উঁকি দিয়েছিল। এই প্রশ্ন জড়ানো চোখে ও মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকাতেই ওর বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো। হৃৎপিন্ডে ধুকধুক শব্দ বেড়ে গেল। ওর মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলো যেন। ও নিজেকে সামলে নিল। ছয় বছর পর হলেও রাহাত লিজিকে চিনতে পারলো। প্রথম দেখাতেই ও লিজিকে চিনতে পারতো, যদি লিজির গায়ে সালোয়ার-কামিজ বা শাড়ি থাকতো-এটা ও হলফ করে বলতে পারে। টপস ও স্কার্ট পড়া অবস্থায় রাহাত লিজিকে দেখবে, এর জন্য ও প্রস্তুত ছিল না। লিজির সঙ্গে ওর দেখা হবে, এটাই ও ভাবেনি। অথচ ওর চোখের সামনে জ্বলজ্যান্ত লিজি দাঁড়িয়ে আছে! এ যেন বিস্ময়ের চেয়েও ঢের বিস্ময়কর দৃশ্য। রাহাত লিজির

দিকে ভালো করে তাকালো। লিজি আগের মত ছিপছিপে নেই। ওর শরীর একটু ভারী হয়েছে। টপস পড়ায় ওর হৃষ্টপুষ্ট বুক নিটোল সৌন্দর্যের অহংকার জানান দিচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে রাহাতের ভেতরে মিহিন একটা তোলপাড় উঠলো। রাহাত দৃষ্টি সরিয়ে নিল। একটু পর ও তাকালো লিজির মুখের দিকে। ওর সুশ্রী মুখমন্ডলে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য প্রতীয়মান। ওর টিকালো নাকে জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝিলিক দিচ্ছে। চিবুকের মাঝখানের ছোট্ট বাঁক ওর মিষ্টি মুখটাকে অপ্সরীর মাত্রা এনে দিয়েছে। প্রায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা লিজিকে এই মুহূর্তে পথভোলা এক পরীর মত লাগছে। কোমল ধবধবে ওর পা দু'টি চাকসাইলের নির্জন রাস্তায় টিউব লাইটের মতো জ্বলজ্বল করছে। পরীর ডানা থাকে এবং পরনে থাকে মখমলের গাউন। লিজির ডানা নেই এবং ওর পরনে টপস ও স্কার্ট। এ টুকুই পার্থক্য। এ কথা ভাবতে ভাবতে রাহাত ওর দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো। যেন সৌন্দর্য পিপাসু ধ্যান ভেঙে যাওয়া এক মন্ত্রমুগ্ধ সন্যাস। এই মুগ্ধতার মধ্যে রাহাত ভাবলো আগে এই লিজিকে এক ঝলক দেখার জন্য ওর বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করতো। ওর দেখা না পেলে দিনভর ছটফট করতো। ওর রাতে ঘুম হতো না। ও লিজির মুখোমুখি কখনো দাঁড়ায়নি। দূর থেকে ওকে দেখেও রাহাত তন্ময় হয়ে যেত। লিজিকে এক ঝলক দেখার জন্য ওকে অনেক বড় খেসারত দিতে হয়েছে। ওকে গ্রাম পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছে। চাকসাইলের চৌধুরী বাড়ির মেয়েদের দিকে আশেপাশের গ্রামের কোন যুবকরা সাধারণত চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায় না। পুরো অঞ্চলে চাকসাইলের চৌধুরী বাড়ির ভীষণ প্রভাব-প্রতিপত্তি। ভাতসাইল গ্রামেও চৌধুরী বাড়ি রয়েছে। এদের প্রভাব বা প্রতিপত্তি নেই। রাহাত ভাতসাইলের চৌধুরী বাড়ির ছেলে। ওরা নামের শেষে চৌধুরী লেখে ঠিক, তবে ওদের সামাজিক প্রভাব নেই। চাকসাইলের চৌধুরী বাড়ির লোকেরা বিত্তশালী আর ভাতসাইলের চৌধুরী বাড়ির লোকেরা নিম্ন মধ্যবিত্ত। অর্থনৈতিক বৈষম্য দু'টি চৌধুরী বাড়ির সামাজিক পার্থক্য নির্ণয় করে রেখেছে।

কিন্তু ভালোলাগার সম্মোহন অনেক সময় ভয়কে তোয়াক্কা করে না। রাহাতও ভয়-ভীতিকে তোয়াক্কা না করে এগিয়ে গিয়েছিল লিজির দিকে। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারেনি। চাকসাইলের চৌধুরী বাড়ির ছেলেরা ওকে গ্রামছাড়া করেছিল। আজ ছয় বছর পর যখন ও গ্রামে ফিরলো, প্রথমেই ও দেখা পেল লিজির। এ যেন অদৃশ্য শক্তির অদ্ভুত রহস্য!

লিজি নিউইয়র্ক থেকে চাকসাইলে নিশ্চয় বেড়াতে এসেছে। রাহাত মনে মনে ভাবে। এর আগেও লিজি চাকসাইলে বেড়াতে এসেছে, তবে সে সময় রাহাত গ্রামে আসেনি। ও লিজির গ্রামে আসার খবরটা পেয়েছিল। কিন্তু ও গ্রামে আসেনি। লিজিকে দেখার প্রবল ইচ্ছেটা ততদিনে থিতিয়ে এসেছিল। গ্রাম ছাড়ার পর থেকে ও লিজিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দিয়েছিল। আজকের দিন পর্যন্ত লিজিকে নিয়ে ওর কোন কল্পনা ছিল না। আজ লিজিকে দেখা মাত্র ওর বুকের ভেতরটা খরস্রোতা নদী হয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে কল্পনার একটা রিদম টের পেল ও। যেন বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বপ্নের লাভার মুখ হাজার বছরের ঘুম ভেঙে খুলে যাচ্ছে। লিজির দিকে কতক্ষণ অপলক তাকিয়েছিল, কে জানে। হঠাৎ রাহাত লক্ষ্য করলো

লিজি ওকে হাতের ইশারায় ডাকছে। তন্ময়তার মধ্যে ফের একটা বিস্ময়ের ধাক্কা এসে লাগলো ওর। রাহাত নিজের চারপাশে চেয়ে দেখে নিল অন্য কাউকে লিজি ডাকছে কিনা। কিন্তু রাহাত যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওর পেছনে বা পাশে কেউ নেই। অনেক মানুষ জীবনে অনেক সময় প্রত্যাশার চেয়ে ঢের বেশি কিছু বুঝি পেয়ে যায়। রাহাতের এখন তাই মনে হচ্ছে। ও বিহ্বলতার মধ্যে এগিয়ে গেল লিজির দিকে। মাত্র কয়েক কদম। রাস্তা পার হয়ে রাহাত গিয়ে দাঁড়ালো লিজির সামনে। ওর বুকের ভেতর তুমুল ভাংচুর হচ্ছে। লিজি ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো। বললো,

'এক্সকিউজ মি, আমাকে একটু সাহায্য করবেন? আই নীড ইউর হেল্প। প্লিজ!'

রাহাত কোন ভাষা খুঁজে পেল না। ও কী বলবে, তা ঠিক করতে পারলো না। মনে মনে বললো, 'একটু সাহায্য কেন, অনেক সাহায্যই তো করতে প্রস্তুত।'

'এক্সকিউজ মি, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

জানতে চাইলো লিজি। রাহাত এবার ধাতস্ত হলো। ও বললো,

'কি বলছিলেন?'

'বলছি, আমাকে একটু সাহায্য করবেন?'

রাহাতকে লিজি চিনতে পারছে না। ব্যাপারটা ও বুঝতে পারলো এবং ও ফের অবাক হলো। লিজির সঙ্গে রাহাতের কখনো কথা হয়নি। কিন্তু দেখা হয়েছে অনেকবার। যতবার দেখা হয়েছে, তারপর রাহাতকে চিনতে না পারাটা একটু ভাবনার বিষয়। রাহাত এই ভাবনায় মুহূর্তেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। লিজি ফের বললো,

'এই যে, শুনছেন? ক্যান ইউ হেল্প মি?'

রাহাত সিগ্ধ কণ্ঠে বললো,

'হ্যাঁ, বলুন-কী করতে পারি?'

লিজি মিষ্টি করে হাসলো। বললো,

'আমার সাইকেলের চেইনটা খুলে গেছে। লাগাতে পারছি না। ওটা একটু ফিক্সড করে দেবেন?'

'ঠিক আছে, দিচ্ছি।'

বলে রাহাত হাতের ব্যাগটি রাস্তার ওপর রেখে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো। বসতেই ওর চোখের সামনে লিজির কোমল দুটি পা জ্বলজ্বল করে উঠলো। এতো কাছ থেকে ও কখনো লিজির খোলা পা দেখেনি। রাহাতের ভেতরে কামনার দমকা হাওয়া বইতে লাগলো। কামনা সিক্ত আবেগ মানুষকে শুধু কাঁপায় না, ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনেকদূর। নিজের ভেতরে নিজে ভাসতে ভাসতে রাহাত মন্ত্রমুগ্ধের মত লিজির সাইকেলের চেইনটা একটু সময় নিয়ে লাগিয়ে দিল। লিজি সাইকেলের সিটে পেট ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে দেখছিল রাহাতের চেইন লাগানোর কাজ। সাইকেলের চেইন লাগানোর পর রাহাত মাথা তুলতেই দেখলো লিজি ওর দিকে ঝুঁকে আছে। ওর টপসের ভেতর থেকে উদ্যত সৌন্দর্যের হৃষ্টপুষ্ট বুকের উর্ধাংশ যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওখানে দৃষ্টি পড়তেই রাহাতের চোখ যেন ঝলসে গেল। মাত্র

কয়েকটা মুর্হূত। রাহাতের সাতাশ বসন্তের জীবন তুমুল কেঁপে উঠলো। উত্তেজনা ও আকর্ষণের মুহূর্তগুলো দ্রুত ফুরিয়ে যায়। রাহাত উঠে দাঁড়াতেই লিজি হাসি মুখে বললো,

'আমি অনেক ট্রাই করেছিলাম। আই কান্ট। বাট আপনি কত সহজে ফিক্সড করে ফেললেন!'

সাইকেলের চেইন লাগানো বিস্ময়ের কী আছে? লিজির বিস্ময় দেখে রাহাতের হাসি পেল। ও হাসলো না এবং জবাবে কিছু বললো না। ভাব যেখানে গভীর, ভাষা সেখানে নীরব। লিজি ফের বললো,

'আপনাকে মেনি মেনি থ্যাংকস।'

ধন্যবাদ পেয়ে রাহাত হাসলো। ওর মনে হলো সাইকেলের চেইনটা আরেকটু সময় নিয়ে লাগালে পারতো। লিজি বললো,

'আপনি কোথায় যাবেন?'

এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রাহাত বললো,

'আপনার নাম কি লিজি?'

রাহাতের প্রশ্নে এবার অবাক হলো লিজি। ওর কপালে কৌতুহলের ভাঁজ পড়লো। ও বললো,

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমার নাম জানেন কী করে!'

রাহাত মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে বললো,

'আপনার অনেক কথাই আমি জানি।'

'তাই নাকি! স্ট্রেঞ্জ!'

'এতে অবাক হবার কী আছে? আপনি তো এই গ্রামে অনেক বছর কাটিয়েছেন।'

'হুম। তা ঠিক। কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন, আর আমি আপনাকে চিনতে পারছি না। এটা কেমন, বলুন তো!'

'অনেক সময় এমন হয়। তাছাড়া আপনি এখন থাকেন নিউইয়র্কে। এই পাড়া গাঁয়ের কথা কী মনে থাকার কথা? সবার কথা মনে রাখাটাও তো কঠিন, তাই না?'

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক। তবে আমি এই গ্রামকে ভীষণ মিস করি।'

'জেনে ভালো লাগলো।'

'কী?'

'এই যে গ্রামকে মিস করেন। পোশাকে-আশাকে শহুরে হলেও মনের দিক থেকে পুরোপুরি শহুরে হননি বলে!'

'হয়তো তাই। তা আপনি কোথায় থাকেন? আপনার নাম কী?'

'আমার বাড়ি ভাতসাইলে।'

রাহাতের নিজের নাম বলতে দ্বিধা লাগছে। ও বললো না। লিজি বললো,

'আপনার নাম বললেন না যে!'

'নাম জেনে কী হবে? আপনার সঙ্গে পথে দেখা হলো, কথা হলো-এটুকুই যথেষ্ট। তা ছাড়া আপনি চাকসাইলের চৌধুরী বাড়ির মেয়ে। আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বলছি কেউ দেখলে আর রক্ষা নেই!'

এ কথায় হেসে ফেললো লিজি। হাসিমুখে ও বললো,

'ডোন্ট ওরি। আমি এখন বড় হয়েছি। আপনাকে কেউ কিছু বললে, আমি দেখবো। তা ছাড়া কেউ কিছু বলবেও না। আগে এমন হতো, এখন দিন বদলেছে, বুঝলেন?'

এ কথা শুনে স্বস্তি পেল রাহাত। ও বললো,

'তারপরও আমরা আপনাদের বাড়ির লোকদের ভয় পাই। আপনার সামনে হয়তো কিছু বলবে না, পরে ঠিকই এর খেসারত দিতে হবে।'

'স্ট্রেঞ্জ!'

'আপনি অবাক হচ্ছেন কেন? আপনি কি জানেন, আপনার জন্য একজনকে গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল?'

প্রশ্নটা করে ফেললো রাহাত। ও ভেবেছিল এর জবাবে কিছু বলতে পারবে না লিজি। কিন্তু লিজি বললো,

'হ্যাঁ, আমি এমন একটি ঘটনার কথা শুনেছিলাম।'

আবার অবাক হলো রাহাত। ও বললো,

'কি শুনেছিলেন?'

'শুনেছিলাম,একটি ছেলে নাকি আমাকে খুব ফলো করতো। এ কথা আমার কাজিনরা জেনে যায় এবং তারা ঐ ছেলেটিকে মামাদের আমবাগানে কয়েকদিন আটকে রেখেছিল। হতে পারে, ওকে আমগাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। আই থিংক ইট ওয়াজ ভেরি হরোয়বল! আই কান্ট সাপোর্ট ইট।'

রাহাতের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সত্যিই লিজির মামাতো ভাইরা ওকে চৌধুরী বাড়ির আমবাগানে তিনদিন হাত-পা বেঁধে আটকে রেখেছিল। খেতে দিয়েছিল ভাতের ফেন। রাহাতের বাবা আলাপ-আলোচনা করে 'তার ছেলে আর কোনদিন লিজিকে অনুসরণ করবে না' এই মর্মে মুচলেকা দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এ ঘটনা গোপন থাকেনি। রাহাতও আর ভাতসাইলে থাকেনি। এক রাশ লজ্জা নিয়ে ও চলে গিয়েছিল ঢাকায়। আজ অনেকদিন পর সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওর চোখে পানি এসে যাচ্ছিলো। ও তা সামলে নিয়ে। ছোট্ট করে বললো,

'আচ্ছা, আসি। আমাকে ভাতসাইল যেতে হবে।'

লিজি বললো,

'আমিও ভাতসাইল যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাবেন?'

লিজির এই প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল রাহাত। ও বললো,

'না, না। আমি একটা ভ্যান নিয়ে চলে যাবো। আমি একটা রিকশা বা ভ্যানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম।'

‘কিন্তু আপনার নামটা বললেন না।’

‘আমার নাম রাহাত। রাহাত চৌধুরী।’

জোর দিয়ে বললো রাহাত। ওর মনে হলো, যে গল্পের শুরু হয়নি, সে গল্পের মাঝখানে ও অর্থহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই গল্পের পরিণতি বললেও কিছু হবে না। সুতরাং গল্পের নায়িকার কাছে নিজের নাম যে কারণে ও গোপন রাখতে চেয়েছিল, সময়ের বিচারে এটি এখন অর্থহীন। এখন ওর আর লজ্জিত হবার কিছু নেই। লিজি বললো,

‘আপনার নাম বলার জন্য ধন্যবাদ। তবে আপনার নামটা চেনা-চেনা লাগছে।’

রাহাত বললো,

‘মনে করে দেখুন, আমাকে চিনতে পারেন কিনা। তবে আমাকে আপনি চিনতে না পারলে, এটা হবে আমার জন্য অনেক স্বস্থির ব্যাপার।’

‘রিয়েলি! হোয়াই?’

‘সব প্রশ্নের জবাব সব সময় দেওয়া যায় না। আমিও আপনার এই প্রশ্নের জবাব এখন দিতে পারবো না।’

এ কথা বলার সময় রাহাত দেখলো রাস্তা দিয়ে একটি ভ্যান এগিয়ে আসছে। ও হাতের ইশারায় ভ্যান থামাতে বললো চালককে। ভ্যানচালক রাহাতের কাছে এসে ভ্যান থামালো। ভ্যানচালক কাঁধে রাখা ছেঁড়া মলিন গামছা দিয়ে তার ঘর্মাক্ত মুখ একবার মুছে নিয়ে রাহাতের উদ্দেশে বললো,

‘কনে যাবেন?’

‘ভাতসাইল।’

এ কথা বলে রাহাত ওর ব্যাগ রাস্তা থেকে তুলে রাখলো ভ্যানের ওপর। এরপর ও ভ্যানে চড়লো। এই কয়েকটা মুহূর্ত ও ইচ্ছে করেই লিজির দিকে তাকালো না। অর্থহীন ভালোলাগা প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কী? রাহাত ভ্যানে চড়ে লিজির দিকে তাকিয়ে শুধু হাত নাড়লো। ভ্যানটা চলতে শুরু করলো। রাহাতকে ‘কোথায় যেন দেখেছে, বা চেনা চেনা লাগছে’ লিজি এই চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল। রাহাতের হাত নাড়ার জবাবে ও পাল্টা হাত নেড়ে বিদায় জানালো। ভ্যানটা একটু দূর যেতেই লিজি রাহাতকে চিনতে পারলো। এই রাহাতই লিজিকে অনুসরণ করতো। ওকেই ওর কাজিনরা আমবাগানে আটকে রেখেছিল। এ কথা মনে করে লিজি আপন মনে হেসে ওঠলো। লিজি মনে মনে ওর এই হাসির নাম দিল ‘লাজুক উচ্ছ্বাস!’

তিন.

ফোনটার রিং বাজছে। ক্রিং ক্রিং শব্দ হচ্ছে। সুমিতা রহমান ফোন ধরছেন না। আজকাল তার ফোন ধরতে ইচ্ছে করেনা। দিনদিন মানুষ কেবল ফোনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ফোনের ব্যবহার কেবল বাড়ছে। সবার হাতে হাতে এখন সেল ফোন। আজকাল মাছ বিক্রেতার কাছেও সেল ফোন থাকে, আশ্চর্য! সেল ফোনের ব্যবহার নিয়ে সুমিতা রহমানের বিস্ময়ের শেষ নেই। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা সব কথাই যেন ফোনে সেরে

নিচ্ছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে অফিসের কার্যক্রম, লেখাপড়া কিংবা গবেষণায় সর্বত্র ফোন অপরিহার্যভাবে কাজে লাগছে। ফোনের দিকে তাকিয়ে চট করে এ কথাটা আরেকবার ভেবে নিলেন সুমিতা রহমান। তিনি ড্রইং রুমে সোফায় বসে আয়েশী ভঙ্গিতে টিভি দেখছিলেন। স্যাটেলাইটের যুগ। ক্যাবলে এখন শত শত টিভি চ্যানেল। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে এক ডজনের বেশি বাংলা চ্যানেল। যুক্তরাষ্ট্র থেকেও এসটিভি ইউএস নামের একটি বাংলা চ্যানেল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচার হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারেন না, চারিদিকে কেন এতো টিভি'র ছাড়াছড়ি।

সুমিতা রহমান এসটিভি ইউস-এর কিছু প্রোগ্রাম নিয়মিত দেখেন। বিশেষ করে এই চ্যানেলে প্রতিদিন সম্প্রচারিত 'আজকের শিরোনাম' অনুষ্ঠানটি তিনি মিস করেন না। কারণ, এই অনুষ্ঠানটি দেখলে দেশ এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো তিনি জেনে যান। বলা যায় এই অনুষ্ঠান দেখে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনার সংক্ষিপ্ত চিত্র পেয়ে যান। বাংলাদেশের মহিলারা সাধারণত বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে হিন্দি ভাষার নাটকের সিরিয়াল দেখেন। কিন্তু তিনি ওসব পছন্দ করেন না। তিনি ইনফরমেটিভ অনুষ্ঠান পছন্দ করেন কিংবা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে যেকোন টক শো। তিনি এসটিভি ইউস-এর স্ক্রিণে আজকের শিরোনাম অনুষ্ঠানটি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। আজকের শিরোনাম অনুষ্ঠানে যখন যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো, তখন ফোনটা বাজতে শুরু করে। ফোনটা বাজছে। তিনি ফোনটার দিকে কিঞ্চিৎ বিরক্ত চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ফোনটার ক্রিং ক্রিং শব্দ এক সময় বন্ধ হয়ে গেল। আগষ্টের মধ্য দুপুর। বাইরে গনগনে রোদ। গরমের তীব্রতা আছে। সুমিতা রহমান বসে আছেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ড্রইং রুমে। এই রুমে বসে বাইরের গরমের উত্তাপ অনুভব করা যায় না। তিনি কাচের জানালা দিয়ে বাইরে একটু তাকিয়ে কথাটি ভেবে নিলেন। তিনি জানালা থেকে টিভির দিকে চোখ ফেরাতেই ফোনটা আবার বেজে উঠলো। তিনি আবার বিরক্ত হলেন। ফোনটা ক্রিং ক্রিং ক্রিং ..তারস্বরে বাজছে। এ সময় বাথরুম থেকে বের হলো মিথিলা। মিথিলা ওর ভেজা চুলগুলো তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে এগিয়ে এলো ফোনের দিকে। সুমিতা রহমান তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মিথিলাকে কেমন পরীর মতো লাগছে। মিথিলা বরাবরই সুন্দরী। ছোট বেলায় ওকে পুতুলের মতো লাগতো। মিথিলা হচ্ছে প্রতিমার মতো। যে কেউ ওর দিকে তাকালে চট করে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না-এটা জানেন তিনি। তারপরও মেয়েকে নিয়ে তার মধ্যে অনড় পাথরের মতো চেপে আছে একতাল কষ্ট। সুমিতা রহমানের অন্যমনস্কতাকে ভেঙে দিয়ে মিথিলা বললো,

'মা, ফোনটা ধরছো না কেন? সেই কখন থেকে বাজছে!'

সুমিতা রহমান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তিনি কথা বলার আগেই মিথিলা দ্রুত এগিয়ে এসে ফোন ধরলো,

'হ্যালো..। জ্বি, বলছি। সত্যি! তাই নাকি! থ্যাংকস গড! আচ্ছা, আমি আসছি। আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন,প্লিজ! রাখি। দেখা হবে।'

ফোন রেখে দিল মিথিলা। সুমিতা রহমান মেয়ের দিকে কৌতুহলী চোখে তাকালেন। মিথিলা কারো সঙ্গে এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে কথা বলে না। টেলিফোনে কথা বলার সময় ও কেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল। গত দু'বছর যাবত তিনি মিথিলাকে এমন উচ্ছ্বসিত হতে দেখেননি। মিথিলা নিজের মধ্যে নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিয়েছে। ওর বয়স বাড়ছে। কিন্তু ও বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। ও কাউকে বিয়ে করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে তাকে। বিয়ে করবে না-এমন পণ কোন মেয়ে করেছে কিনা-সুমিতা রহমানের জানা নেই। মেয়ের জেদ উপেক্ষা করে তিনি দু'দফা ওর বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু মিথিলার জেদের সঙ্গে পারেননি। ও হঠাৎ করে একরোখা হয়ে গেছে। এ নিয়েই সুমিতা রহমানের কষ্ট। তিনি অনেক ভেবে দেখেছেন, এ যুগের মেয়েদের মধ্যে যে কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি মেনে নেবার মানসিকতা কমে আসছে। পরিবারের সিদ্ধান্ত মেনে না নেওয়ার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে চায়। তারা নিজেদের আবেগ নিয়ে যতটা অনুরাগী, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ততটা অবদমিত। বিশেষ করে মিথিলার চরিত্রের মধ্যে এটা প্রকট। একজনকে ভালোবাসলে তাকেই বিয়ে করতে হবে, এ ধরনের সিদ্ধান্তে অটল থাকা মেয়েদের মানায় না। মেয়েদের অনেক সময় অনেক কিছু মেনে নিতে হয়। বাবা-মা বা পরিবারের পছন্দের মূল্য দিতে হয়। কিন্তু তার মেয়েটি সে রকম নয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মিথিলা যাকে পছন্দ করে, সেই ছেলেটি দু'বছর যাবত নিখোঁজ। স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে ও। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া একটি ছেলের জন্য কোন শিক্ষিত ও সুন্দরী মেয়ে কত বছর অপেক্ষা করতে পারে? আর ঐ ছেলেটিই বা কেমন? মিথিলাকে যদি সে সত্যিই ভালোবাসে, একবারও ওর খোঁজ নিচ্ছে না কেন? এই প্রশ্নের জবাব জানা নেই সুমিতা রহমানের। এই প্রশ্ন মিথিলাকে তিনি কয়েকবার করেছেন। মিথিলা এর কোন জবাব দেয়নি কখনো। প্রশ্ন শুনে ও মন খারাপ করে থেকেছে। তাই তিনি আর এই প্রশ্ন করেন না ওকে। ও যেভাবে থাকতে চায়, থাকুক। মনে মনে কথাগুলো ভেবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। মিথিলা ওর রুমের দিকে যাবার সময় সুমিতা রহমান বললেন,

'তুমি কি এখন বের হবে?'

'হ্যাঁ, মা।'

'কে ফোন করেছিল, রাশেদ?'

'কী করে বুঝলে?'

'তোমার উচ্ছ্বাস দেখে। রাশেদ বুঝি তোমার ভালো বন্ধু?'

'মা, তুমি এই প্রশ্নটা আগেও করেছো। রাশেদ আমার বন্ধু নয়। আমার তিন বছরের সিনিয়র। তিনি চাকরি করছেন। আর আমি পোস্টিংয়ের জন্য বসে আছি। আমার পোস্টিং নিয়ে তার সঙ্গে কথা হচ্ছিলো। '

'ও কী বললো?'

‘বললো বগুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি পোস্টিং আছে। চাইলে আমি সেখানে জয়েন করতে পারি।’

‘বলো কী! ঢাকা ছেড়ে বগুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেন যাবে? এতেই তুমি খুশি হয়ে গেলে?’

‘কি করবো মা। ইন্টার্নি করে বসে আছি। অনেকদিন তো বসে থাকলাম। আর ভালো লাগছে না। ডাক্তার হয়েছি তো ঘরে বসে থাকার জন্য নয়?’

‘তুমি ঢাকায় বসে প্র্যাকটিস করতো পারো বা এফআরসিএস বা এমআরসিপি পড়তে লন্ডন চলে যাও। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গাঁয়ে তুমি থাকতে পারবে না। তোমার থাকা ঠিকও হবে না। এটা তুমি বুঝতে পারছো না কেন?’

সুমিতা রহমানের কণ্ঠে রাগের ঝাঁঝ। মিথিলা বললো,

‘মা, তুমি তো জানো, আমি এতোদিন রেজার জন্য অপেক্ষা করেছি। ও ফিরে আসেনি। আমি আর ওর জন্য অপেক্ষা করবো না। এখন আমাকেই ওকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি বিদেশ চলে গেলে ওর সঙ্গে দেখা হবার কোন সম্ভবনা নেই।’

মেয়ের কথা ভালো লাগলো না তার। আজকালকার মেয়েগুলোর মুখে মুখে কথা বলার স্বভাব! ওরা চাল-চলনে আধুনিক, কিন্তু সেকেলে মানসিকতা ছাড়তে পারছে না। অগ্র পশ্চাত না ভেবে হুট করে কাউকে ভালোবেসে ফেলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ওরা পুরানো দিনের সিনেম্যাটিক কনসেপ্ট লালন করছে মনে। বাবা-মায়ের উদ্বেগকে ওরা কেয়ারই করছে না। সুমিতা রহমান এ কথা মনে মনে ভেবে রাগ পুষে বললেন,

‘যে ছেলেটি এতোদিন যাবত নিরুদ্দেশ, তার জন্য কতকাল অপেক্ষা করবে তুমি!’

মিথিলা এই প্রশ্নের জবাব আগেও অনেকবার ওর মাকে দিয়েছে। তাই প্রশ্নটা শুনে ও একটু হাসলো। বললো,

‘নিজেই জানি না, কতকাল অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমি জানি, আমি ওর দেখা পাবো।’

‘যে ছেলে তোমার কথা ভাবে না। যে এতোদিনেও তোমার খোঁজ নেয়নি, তার জন্য তুমি কেন যে নিজের জীবন নষ্ট করছো, বুঝিনা!’

মায়ের এ কথায় আহত হল মিথিলা। ওর ভেতরে চাপা কান্নার একটা ঢেউ আছড়ে পড়লো। ও ঢেউটা সামলে নিয়ে মায়ের উদ্দেশে বললো,

‘রেজা নিরুদ্দেশ হয়নি। ও অভিমানে স্বেচ্ছায় হারিয়ে গেছে। আর এর জন্য তোমরাই দায়ী। দায়ী আমিও। সেদিন যদি তোমরা অন্য একজনের সঙ্গে আমার বিয়ের আয়োজন না করতে, তাহলে রেজা আমার জীবন থেকে হারিয়ে যেত না। এটা তুমি জেনেও এ কথা বললে মা!’

সুমিত রহমানের মেয়ের বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বিব্রত হয়ে গেলেন। সত্যিই মিথিলাকে তিনি ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ওর বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতেই হঠাৎ করে এই বিয়ের আয়োজন করতে হয়েছিল সেদিন। মৃত্যু পথযাত্রী বাবার অনুরোধে মিথিলা বিয়েতে রাজী হয়েছিল অনেকটা উপায়হীনভাবে। বিয়েটা হয়তো হয়ে যেত, কিন্তু

বিয়ের সময় রেজা এসে হাজির হলো। মিথিলার সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটি হলো। মিথিলা রেজাকে ফিরিয়ে দিলেও নিজেকে ফেরাতে পারে নি। রেজা চলে যেতেই ও অসুস্থ বাবাকে জানিয়ে দিল ও এই বিয়ে করছে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে, শুধু বাবার অনুরোধে। মেয়ের কথা শুনে ওর বাবা মুমূর্ষু অবস্থায় একটু হেসে উঠেছিল। এই হাসিটাই ছিল তার শেষ হাসি। হাসি মুখেই তিনি মারা যান। বিয়ে বাড়ি পরিণত হয় শোকের বাড়িতে। স্মৃতির সেলুলয়েডের ফিতায় সেদিনের দৃশ্য এখনো ভেসে ওঠে সুমিতা রহমানের চোখের সামনে। তিনি মিথিলার কথার কোন জবাব দিলেন না। একেবারে চুপসে গেলেন। মায়ের নীরবতা দেখে মিথিলা বললো,

'এখন কোন কথা বলছো না কেন?'

'কি বলবো? আমার বলারই বা কি আছে?'

'তাহলে সুযোগ পেলেই ও সব কথা বলো কেন, মা?' মেয়ের কথায় সুমিতা রহমান বিষাদ মুখে বললেন,

'আমি যে মা! তুই মা হবার পর বুঝতে পারবি, মায়ের বেদনা কিসে।'

'মা, ভেবো না, আমি তোমার দুঃশ্চিন্তার কথা বুঝতে পারি না। আমাকে নিয়ে তুমি দুঃশ্চিন্তা করো না, মা।'

'তা কি আর ইচ্ছে করে করি। আচ্ছা, বলতো তুই রেজার জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করবি?'

উদ্বিগ্ন মায়ের এই প্রশ্নের সামনে একটু ভাবলো মিথিলা। এরপর ভারী কণ্ঠে বললো,

'রেজাকে কষ্ট দিয়ে, মিথ্যা বলে যে পাপ আমি করেছি, ওর জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করে আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো। এটা কি অন্যায়? বলো মা?'

সুমিতা রহমানের একটু নিচু গলায় বললেন,

'ন্যায়-অন্যায়ের অংক করে জীবন চলে না। জীবনের একটা রূপ আছে, এর বিস্তার আছে, আছে ব্যঞ্জনাও। কিন্তু তুমি এক স্থানে আটকে থাকলে জীবনের রূপ, বিস্তার, ব্যঞ্জনা সবকিছু হারিয়ে ফেলবে। এক সময় হয়তো দেখবে, তোমার হাতে অপেক্ষার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। সেদিন আমার কথা মনে করে তোমার কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে। বুঝলে?'

'মা, সেদিন ওই দীর্ঘশ্বাস হবে আমার অহংকার!'

এ কথা বলে মিথিলা নিজের রুমের দিকে চলে গেল। মেয়ের এ কথায় সুমিতা রহমান আর কোন কথা বাড়ালেন না। তিনি যতবার মেয়েকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, ততবারই ব্যর্থ হয়েছেন। মেয়ের সঙ্গে তিনি কথায় পারেন না। কথায় না পারলেও তিনি মিথিলাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। ওর বাবা বেঁচে নেই। তিনি আর কতদিন বাঁচবেন, কে জানে! তিনি বেঁচে থাকতে মেয়েকে দেখে যেতে চান কারো সংসারের সত্যিকারের প্রতিমা হিসাবে। কিন্তু তার এই ইচ্ছা আদৌ পূরণ হবে কি না, এ নিয়ে তিনি সন্দিহান। সুমিতা রহমান রিমোট টিপে টিভিটা অফ করে দিলেন। টিভির অনুষ্ঠান এই মুহূর্তে তার ভীষণ বিরক্তিকর লাগছে। তিনি সোফায় গা এলিয়ে দু'চোখের পাতা এক করার চেষ্টা করলেন। তাকে গ্রাস করলো এক রাশ হতাশা।

চার.

জালাল একটু লজ্জিত গলায় বললো,

'জ্বে, পেশায় আমি চোর।'

এ কথা বলে ও চুপ হয়ে গেল। লিজি জালালের কথা শুনে ভীষণ অবাক হলো। কী কাজ করো? এর জবাবে কেউ অকপটে বলে যে, সে চুরি করে-এমন কথা ও কখনো শোনেনি। চোরের কথা ও শুনেছে, তবে লিজি কখনো চোর দেখেনি। চোর কেমন হয়, ও তা জানে না। চোর কেমন হতে পারে, এ নিয়ে ও কখনো কল্পনাও করেনি। কিন্তু জালালকে দেখে চোর মনে হচ্ছে না। জালাল ওর সামনে নিঃসঙ্কোচে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। লিজি জালালের আপাদমস্তক দেখে নিল।

লিজি মানুষের এ ধরনের সরলতা নিউইয়র্ক শহরে দেখেনি। নিউইয়র্ক শহরটা অবশ্য বিভিন্ন দেশের মানুষে ঠাসাঠাসি। এখানে নানা দেশ, জাতি ও বর্ণের লোকদের মধ্যে ভন্ড, প্রতারক, ছিনতাকারীসহ বিভিন্ন অপরাধীরা রয়েছে। এটি অভিবাসীদের শহর বলে এখানকার জনজীবন তেমন শান্ত নয়। যারা শান্তিপ্রিয় এবং নীরবে-নিভৃতে থাকতে চান, তারা এ শহরে থাকলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠবেন। লিজি নিউইয়র্কে থাকলেও সারি সারি অট্টালিকার ঐ পাথুরে শহরটা ওর ভালো লাগে না। এই শহরের নগর সৌন্দর্যের অহংকারই যা আছে, সুনসান প্রকৃতির কোমল মমতা এখানে লিজি দেখতে পায় না। অবশ্য এই শহর থেকে বেড়িয়ে একটু দূরে গেলেই আধুনিক গ্রামের নিবিড় সান্নিধ্য পাওয়া যায়। তারপরও বাংলাদেশের গ্রাম ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাই ও সুযোগ পেলেই চলে আসে বাংলাদেশে। লিজি এবার তিন বছর পর বাংলাদেশে এসেছে। চাকসাইল গ্রামে ওর জন্ম। এখানে ওর নানান বাড়ি। এখানেই কেটেছে ওর শৈশব। কৈশোরে পা দিতেই মা'র সঙ্গে ওকে চলে যেতে হয়েছে বাবার কাছে, নিউইয়র্কে। টানা ১০ বছর যাবত ও নিউইয়র্ক শহরে বাস করছে। নিউইয়র্কে ও কখনো চোর দেখেনি। এই মুহুর্তে ওর সামনে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রয়েছে জালাল নামের এক ছিঁচকে চোর। ও জালালের দিকে চেয়ে আনমনে এ সব কথা ভাবছিল।

লিজি বসেছিল স্কুলের বারান্দায় একটি চেয়ারে। ও চেয়ারে বসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য উপন্যাস শেষের কবিতা পড়ছিল। জুনের বিকেল। আজ রোদের তেজ না থাকলেও বাতাসে গরমের হালকা উত্তাপ। একটু পর পরই বাতাস এসে হামলে পড়ছিল। গরম নিঃশ্বাসের মত বাতাস। এই বাতাসের উপদ্রব নিয়ে লিজির কোনও বিরুক্তি নেই। কারণ, একবার বেড়াতে গিয়ে এরচেয়ে ঢের গরম বাতাসের হলকা ওকে সহ্য করতে হয়েছিল এ্যারিজোনাতে। যুক্তরাষ্ট্রের এই অঙ্গরাজ্যটিকে মরুভূমির সঙ্গে সবাই তুলনা করা চলে। এই অঙ্গরাজ্যে যারা থাকেন গ্রীষ্মকালে তারা তীব্র দাবাদাহের কারণে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। আবার শীতকালে এখানে ছেলেরা শার্ট-প্যান্ট বা মেয়েরা শাড়ি পড়ে ঘুরে বেড়ায়। শীতকালে নিউইয়র্ক কিংবা ওয়াশিংটনে যখন তুষারপাতের তান্ডব, এ্যারিজোনায়

তখন খটেখটে রোদের ঝিলিমিলি। যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল ভূ-খন্ডে একই সময় প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় রূপ! প্রকৃতির এই বৈচিত্রটা লিজি দেখেছে। বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালের গরমকে ও একেবারেই পাত্তা দেয় না। আজও ভাতসাইল গ্রামের খটখটে রোদের তাতানো বিকেলকে ও পাত্তা না দিয়ে স্কুলের বারান্দায় চেয়ারে বসে বই পড়ছিল। বই পড়ার সময় হঠাৎ ও দেখতে পায় জালাল ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জালালের পড়নে লুঙ্গি এবং ছেঁড়া জামা। খালি পা। উচ্চতায় পাঁচ ফুট চার বা পাঁচ ইঞ্চি হবে। লিকলিকে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, এলোমেলো। লিজি জালালের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে এবার বললো,

'জালাল, তুমি চুরি করো কেনো?'

'কী করুম, কোন কাজ পাই না। তাই চুরি করি।'

জালালের সহজ জবাব। লিজি বললো,

'কি চুরি কর?'

'তেমন কিছু না। হাতের কাছে যা পাই, তাই চুরি করি। এই ধরেন হাঁড়ি-পাতিল, বদনা, লাউ, মুরগী, লুঙ্গি-গামছা..'

'বুঝেছি, বুঝেছি। এবার থামো।'

লিজির কথায় চুপ মেরে গেল জালাল। লিজি একটু ভেবে বললো,

'তুমি এখানে কেনো এসেছো? আমার কাছে কি চাও? আমার কি চুরি করতে এসেছো তুমি?'

এ কথায় জালাল লজ্জিত হলো। ও মাথা নিচু করে গলা নামিয়ে বললো,

'জ্বে, আমি আইছি স্কুলে ভর্তি হইতে। শুনছি, এই স্কুলে রাতের বেলা লেখাপড়া হয়?'

লিজি ফের একটু অবাক হলো। গ্রামের ছিঁচকে চোর স্কুলে লেখাপড়া করতে এসেছে শুনে ও বিস্মিত হলো। এই স্কুলে রাতের বেলায় গ্রামের নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের লেখাপড়া শেখানো হয়। এই নৈশ্য স্কুলের শিক্ষক হচ্ছে আবিদ। সে বয়স্ক লোকদের ভালোমত বর্ণমালা শেখায়। ও সাহায্য করে তাকে। আবিদ শিক্ষক হিসাবে ভালো হলেও, মানুষ হিসাবে ওস ভীষণ অহংকারী! গ্রামের একটি নৈশ্য স্কুলের মাস্টার, অথচ তার সে-কী দাম্ভিক ভাব! এমন একটি লোককে ওর মামা কেন স্কুলের শিক্ষক করেছেন, তা ও বুঝতে পারছে না। লিজি অকারণে আবিদের কথায় ডুবে গেল। লিজি গ্রামের লোকদের কাছে শুনেছে, আবিদ অনেকদিন আগে এই গ্রামে এসে বটতলায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ওর মামা আবিদকে পথ থেকে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর থেকে আবিদ এখানেই থিতু গেড়ে বসেছে। আবিদ কোথাকার, কোথা থেকে এসেছিল আবার কোথায় বা যাচ্ছিলো, সে কথা কেউ জানে না। আবিদের আপনজন বলতে পৃথিবীতে কেউ আছে-কি নেই, তা কেউ বলতে পারেনা। আবিদ লেখাপড়া কতটুকু শিখেছে, সে খবরও কেউ জানে না। এমন একটি লোককে দিয়ে ওর মামা কেন স্কুল চালাচ্ছেন, তা ওর বোধগম্য নয়। ব্যাপারটা লিজির কাছে প্রশ্ন হয়েই আছে।

'আপনে কি জানেন, মাস্টার সাহেব কখন আইবো?

জালালের প্রশ্নে লিজির সম্বিত ফিরে আসে। লিজির একটা মুদ্রা দোষ হচ্ছে, ও কাউকে নিয়ে অকারণে খুব বেশি ভেবে ফেলে। অনেক আযাচিত প্রশ্নের জবাব খোঁজে। এই মুহূর্তে ও সেরকমই ভাবছিল। লিজি জালালের দিকে চেয়ে বললো,
'তার আগে বলো, তুমি লেখাপড়া শিখে কি করবে?'
এ কথা শুনে একগাল হাসলো জালাল। ও বললো,
'লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত চোর হবো, আপা!'
'তাই নাকি!'
বিস্ময় প্রকাশ করেই লিজি হাসতে লাগলো। জালাল এতে লজ্জা পেল না। লিজি অনেকক্ষণ হেসে নিল। লিজির মনে হলো, যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য বিষয়ে অগণিত শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। এ সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখার অনেক বিষয় বৈচিত্র থাকলেও চুরি শেখানোর মত বিষয় বা পাঠ্য নেই। থাকলে ভালো হতো। তবে জালালকে ও চুরি শেখার ক্লাশে ভর্তি করিয়ে দিত। গাঁয়ের ছিঁচকে চোর হতো আধুনিক শিক্ষিত চোর! এ কথা কল্পনা করে লিজি আপন মনে আবার একটু হেসে ওঠলো। জালাল লিজির হাসিকে গায়ে না মেখে বললো,
'আপা, আবিদ স্যার কি স্কুলের ভেতর আছেন?'
'না।'
অকারণে মিথ্যা কথা বললো লিজি। কেন ও মিথ্যা কথা বললো, ও নিজেও তা জানে না। কখনো কখনো অনেকের এমন হয়। জালাল ফের প্রশ্ন করলো,
'তিনি কোথায় গেছেন?'
'বিলে স্নান করতে।'
লিজি আরেকটি মিথ্যা কথা বললো। একটা মিথ্যা বললে আরেকটি মিথ্যা বলতে হয়। তারপর আরেকটি। যত প্রশ্ন তত মিথ্যা জবাব। জালাল আর প্রশ্ন না করে বললো,
'ঠিক আছে। আমি বিলের দিকে যাই।'
'আচ্ছা, যাও।'
জালাল বিলের দিকে হাঁটতে লাগলো।
লিজি জালালের চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। জালাল গুটিগুটি পায়ে অনেকটা কচ্ছপের গতিতে হাঁটতে হাঁটতে একটা বাঁকে মিলিয়ে গেল। লিজি আর বই পড়ায় মনযোগ দিতে পারলো না। জালালের কথা ওর মনে বারবার ভেসে ওঠতে লাগলো। ওর মনে এক পশলা অনুশোচনাও পেখম ছড়িয়ে রইলো। কারণ, আবিদ স্কুলের ভেতরই আছে, অথচ লিজি জালালকে সত্য কথা বলেনি। বয়স্ক চোর লেখাপড়া শিখে কী করবে? এই প্রশ্নটি লিজিকে মিথ্যা বলায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রভাবিত করেছে। এখন ওর কেমন খারাপ লাগছে।

বিকেল গোধূলীর পেয়ালায় জমে যাচ্ছিলো। এ সময় স্কুলের ভেতর থেকে বের হলো আবিদ। সে স্কুলের বারান্দায় বসে থাকা লিজিকে না দেখার ভান করে হেঁটে যাচ্ছিলো। তাকে পেছন থেকে ডাকলো লিজি,

'এই যে শুনুন?'

লিজির ডাকে আবিদ ঘুরে দাঁড়ালো। ওর চোখে মুখে বিরক্তি। লিজির দিকে একটু তাকিয়ে বললো,

'আমাকে বলছেন?'

'তাহলে কাকে বলবো? এখানে কি অন্য কেউ আছে?'

লিজির গলায় তেজ। আবিদ শান্ত কণ্ঠে বললো,

'বলুন?'

'আপনার স্কুলে ভর্তি হতে এক ছিঁচকে চোর এসেছিল।'

'হ্যাঁ, আমি আপনাদের কথা শুনেছি।'

'আপনি স্কুলে নেই বলে আমি তাকে মিথ্যা কথা বলেছি।'

'ওটা না বললেও পারতেন।'

'আপনি কি চোরকে পড়াতেন? ভর্তি করাতেন স্কুলে!'

এ কথায় আবিদ একটু হাসলো। ও বললো,

'আমার ক্লাশে আরো নয়জন চোর আছে।'

'বলেন কি! সত্যি!'

'এতে অবাক হচ্ছেন কেনো? চোরেরা কি লেখাপড়া শিখতে পারে না?'

'চোর লেখাপড়া শিখে কী করবে?'

'ওদের জ্ঞান বাড়বে। ওদের দৃষ্টি প্রসারিত হবে। ওদের সহজেই কেউ মিথ্যা বলে বোকা বানাতে পারবে না। হয়তো লেখাপড়া শিখলে ওদের আর অভাবের কারণে চুরি করতে হবে না।'

এ কথা বলেই আবিদ হাঁটতে লাগলো। পেছন থেকে লিজি বললো,

'শুনুন!'

আবিদ দাঁড়ালো এবং লিজির দিকে ঘুরে বললো,

'বলুন?'

'আপনি সব সময় আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেন কেনো?

'কেমন আচরণ?

'এই যে, গম্ভীর হয়ে থাকেন?'

'এটা আমার স্বভাব।'

'তাছাড়া কথাও খুব একটা বলেন না। আপনি ছাত্রদের পড়ান কি করে? নাকি ছাত্রদের সামনেও মুখ গোমরা করে থাকেন?'

এ কথা বলে লিজি হাসার চেষ্টা করলো। আবিদ বললো,

‘আমাকে এ সব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেনো?

‘জিজ্ঞেস করছি, কারণ, আপনাকে আমার মামা একটি স্কুলের দায়িত্ব দিয়েছেন। আর আমাকেও বলেছেন যে, আপনাকে সাহায্য করতে। আমি বুঝতে পারছি না, আপনাকে মামা কেনো এই দায়িত্ব দিয়েছেন।’

‘আর কিছু বলবেন?’

হ্যাঁ, আমি আরো কিছু বলবো। আই মিন বলতে চাই।

আবিদ একটু এগিয়ে এসে বললো,

‘বলুন।’

লিজি তাকালো আবিদের দিকে। আবিদ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। লিজি জেরা করার মত করে বললো,

‘আপনার বাড়ি কোথায়? আপনি আগে কী করতেন? লেখাপড়া কতটুকু শিখেছেন?

এমন প্রশ্ন শুনে আবিদ অবাক হলো। এমন প্রশ্ন ওকে কেউ খুব একটা করেনা। এমনকি লিজির মামা আকরাম চৌধুরীও ওকে এই প্রশ্ন করেননি। হঠাৎ করে এই মেয়েটি কেন ওকে এই প্রশ্ন করছে, তা ও বুঝতে পারছে না। ও এর কোন জবাব দিল না। লিজি জবাব না পেয়ে বললো,

‘কী হলো, আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না কেন?’

‘এই প্রশ্নের জবাব আমি কাউকে দেই না।’

ভরাট ও দৃঢ় কণ্ঠে বললো আবিদ।

‘কেনো?’

‘এরও কোনও জবাব দিই না।’

‘আপনি কি খুনি? কোনও কারণে খুন-টুন করে ছদ্মবেশ ধরেছেন?’

‘আর কিছু বলবেন?’

‘বললে কি হবে? কোনও প্রশ্নের জবাবই তো দিচ্ছেন না।’

‘কেনো আমার ব্যক্তিগত বিষয় জানতে চাচ্ছেন?’

‘কৌতুহল। শ্রেফ কৌতুহল।’

‘আমাকে নিয়ে আপনার কৌতুহল কেনো?’

‘সত্যি, আপনাকে নিয়ে আমার দিনদিন কৌতুহল বাড়ছে!’

এ কথা বলে লিজি হাসলো। যেন রসিকতা করছে। আবিদ বললো,

‘কিন্তু কেনো আপনার কৌতুহল বাড়ছে?’

‘আরে, আপনি দেখছি, আমাকে প্রশ্ন করছেন? আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে আপনার প্রশ্নের জবাব দেব কেনো?’

আবিদ চুপ হয়ে গেল। লিজি বললো,

‘কী ব্যাপার, চুপ করে আছেন যে!’

‘দেখুন, আপনার কৌতুহল মেটানোর সময় আমার নেই। আমি যাচ্ছি।’

আবিদ যাবার জন্য উদ্যত হতেই লিজি কণ্ঠে কপট রাগ তুলে বললো,
'মিঃ আবিদ, আমাকে রাগাবেন না, বলছি!'
আবিদ অবাক চোখে লিজির দিকে তাকালো। লিজি অগ্নিমূর্তির মতো তাকিয়ে আছে আবিদের দিকে। আবিদ এক ঝলক লিজিকে দেখে হতাশ গলায় বললো,
'আপনি অহেতুক রাগছেন!'
'অহেতুক নয়। আমি রাগছি, আপনি আমাকে উপেক্ষা করছেন বলে। আপনি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছেন! এবং সব সময় অপমান করে যাচ্ছেন!'
আবিদ বললো,
'আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন কেনো? আসলে আপনি আমার কাছে কি চান?'
'আপনার পরিচয় জানতে চাই। আপনার ছদ্মবেশ নেবার কারণ জানতে চাই।'
'আমি কোনও ছদ্মবেশ নেইনি।'
'দেখুন, আমেরিকাতে প্রত্যেকটি মানুষের পরিচয় পত্র আছে। এই পরিচয়পত্রে নাম ছাড়াও জন্মদিনের তারিখও উল্লেখ থাকে। এটা সভ্য দেশের স্বাভাবিক পদ্ধতি। পরিচয় গোপন করার মধ্যে সুস্থ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়না। আপনি কি এটা জানেন?'
'আপনার জানার সঙ্গে আমার জানার বিস্তর ফারাক আছে। আপনার চেনা দেশ বা সমাজের সঙ্গে আমার চেনা সমাজের যেমন মিল নেই, তেমনি আছে বৈপরীত্য। আপনার চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তারও যথেষ্ট অমিল আছে। আপনার সঙ্গে কথা বলে এটুকু শুধু বুঝতে পারছি।'
'আমাকে নিয়ে আপনার কৌতুহল নেই?'
'না, আমার কৌতুহল থাকবে কেনো?'
'কোনও কিছুর প্রতি আপনার কৌতুহল নেই?'
'না।'
'কেনো নেই?'
'আমি এ সব কেনোরও উত্তর দিইনা।'
'ঠিক আছে, সত্যি করে বলুন তো আমার প্রতি আপনার কোন কৌতুহল নেই? যেমন আমি কে, কোত্থেকে এসেছি, কেনো এসেছি, কয়দিন থাকবো-এই সব জানতে ইচ্ছে করে না?'
'আপনার প্রতি আমার কৌতুহল কেনো থাকবে? এই প্রশ্নটি বারবার কেনো করছেন?'
'সত্যি বলছেন! কৌতুহল নেই?'
আবিদ একটু হাসলো। ও বললো,
'আপনি কোনো মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাতে পারেন।'
'আমাকে নিয়ে যাবেন, কোনো ডাক্তারের কাছে?'
লিজি রসিকতায় আবিদ বিস্ময় প্রকাশ করলো,
'আমি আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো কেনো!'
'একজন মানুষ হিসাবে অপর একজন মানুষকে সাহায্য কেউ করে না বুঝি!'
'আপনার সঙ্গে কথা বলে পারবো না। আমি কি যাবো?'

‘যেতে দেব, শুধু একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।’
‘কী প্রশ্ন?’
‘আপনি কে?’
এবার আবিদ ভীষণ বিরক্ত হলো। ও একটু ভাবলো। নিজের ভেতরে নিজেকে প্রস্তুত করে বললো,
‘আমি একজন নিতান্ত সাধারণ মানুষ। আমার একটা নাম আছে। সেটা হলো আবিদ। পুরো নাম আবিদ রেজা। আমার আর কোনও পরিচয় নেই। আমার কোনও যোগ্যতা নেই। সমাজে টিকে থাকার আমার কোনও সংগ্রাম নেই। পথ চলার স্বপ্ন নেই। লক্ষ্য নেই। বেঁচে থাকার প্রেরণা নেই। ধরে থাকার মত অবলম্বন নেই। হারিয়ে যাবার মত নিজের কিছু নেই। আমি এক যাযাবর। পথ চলতে চলতে এই অচেনা গাঁয়ে এসে থমকে গেছি। আবার হয়তো একদিন পথে নেমে হারিয়ে যাবো কোথাও। এবার হয়েছে?’
একটু রাগী গলায় বললো আবিদ। লিজি বললো,
‘পৃথিবীতে আপনার আপনজন বলতে কেউ নেই?’
‘আমিই আমার আপনজন।’
‘জানেন, আমেরিকাতেও এ ধরনের লোক আছে। তাদের বলে হোমল্যাস। আবিদ আর দাঁড়ালো না। ও হনহন করে হাঁটতে লাগলো। লিজি একটু বিষণ্ণ মনে ওর চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। অপছন্দ করা এই লোকটির জন্য এই মুহূর্তে ওর মায়া হলো। লিজি মনে মনে এই মায়ার নাম দিল ‘অনুকম্পা’।

পাঁচ.

ছোট্ট একটা স্বপ্ন দেখে মিথিলার ঘুমটা হঠাৎ করে ভেঙে গেল। স্বপ্নে ও রেজাকে দেখতে পেল। স্বপ্নটা এ রকম, একটি বিলের সামনে রেজা দাঁড়িয়ে আছে। বিল জুড়ে অসংখ্য শাদা বক, পানকৌড়ি আর হাঁস সাঁতার কাটছে। রেজা মুগ্ধ হয়ে তা দেখছিল। কী মনে করে, এক সময় রেজা একটা ঢিল ছুঁড়লো বিলে। সঙ্গে সঙ্গে বক ও পানকৌড়ি বিলের জল থেকে উড়ে এলো রেজার দিকে। হাঁসগুলো কটমট করে তাকালো। বক ও পানকৌড়ি উড়ে এসে রেজার চারপাশে বৃত্তাকারে চক্কড় দিতে লাগলো। রেজা ভয় পেয়ে মাটিতে বসে পড়লো। বক ও পানকৌরিরা অসহায় রেজার চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। আফ্রিকার গহীন জঙ্গলে পথভোলা মানুষকে শত্রু ভেবে উপজাতি জংলীরা যেরকম চক্কর দেয়। স্বপ্নটা এ পর্যন্ত দেখলো মিথিলা। ভয়ে ওর ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম ভাঙতেই ওর রেজার কথা মনে পড়লো। আর তখুনি মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। এই বিষন্নতা ওর জন্য নতুন নয়। প্রায়ই মিথিলার মন বিষন্ন থাকে। এর একটিই কারণ, সেটি হচ্ছে রেজার অন্তর্ধানের ঘটনা। দু’বছর আগে একদিন একটি বিচ্ছিরি ঘটনার শিকার হয়েছিল মিথিলা। এই ঘটনার অশুভ লগ্নে রেজা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় উপায়হীনভাবে সেদিন রেজাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল মিথিলা। ওর আর কোনও পথ ছিল না। সেদিনের কথা মনে পড়লে ও ভীষণ মূষড়ে পড়ে।

তীব্র অপরাধবোধ ওকে কুড়ে কুড়ে খায়। ও নিজের ভেতরে নিজে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই মুহূর্তে মিথিলার চোখের সামনে ভেসে ওঠলো সেদিনের গ্লানিময় ঘটনার কথা। মিথিলা ফিরে গেল প্রায় দু'বছর আগে এক অশুভ দিনের অধ্যায়ে। ওর বাবা দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েছিলেন। ভুগছিলেন দুরারোগ্য ক্যান্সারে। তার চিকিৎসা চললেও তিনি বেশিদিন আর বাঁচবেন না, ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন। নিজেদের বাড়িতে ওর বাবার চিকিৎসা চলছিল। এমনি অবস্থায় হঠাৎ একদিন ওর বাবার অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। মায়ের টেলিফোন পেয়ে মিথিলা হোস্টেল থেকে ছুটে যায় কুমিল্লায়, নিজেদের বাড়িতে। এই দিনটি ছিল মিথিলার জীবনে সবচেয়ে অশুভ একটি দিন। সেদিন আগে থেকেই বাবা ও মা ওর বিয়ের আয়োজন করে রেখেছিলেন। পাত্র ঠিক করাই ছিল। পাত্র মিথিলার বাবার ঘনিষ্ট এক বন্ধুর ছেলে। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ঢাকাতেই সেটেলড। একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করছে। বাবার মুমূর্ষ আবস্থার কথা শুনে হন্তদন্ত হয়ে মিথিলা বাড়ি এলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার বিছানায়। ঠিক সে সময়, মিথিলার মৃত্যু পথযাত্রী বাবা শফিক রহমান মেয়ের দু'হাত ঝাপটে ধরলেন। মিথিলা কাঁদছিল বাবার জন্য। এই বিশেষ মুহূর্তে শফিক রহমান মেয়ের হাত ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন,

'তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, মা।'

'অনুরোধ! আমার কাছে!'

'হ্যাঁ, মা।'

'বলো বাবা। আমার কাছে কী তোমার অনুরোধ?'

'আগে কথা দাও, অনুরোধ রাখবে?'

'হ্যাঁ, রাখবো। বলো কী তোমার অনুরোধ।'

'কথা দিচ্ছো কিন্তু!'

'আহা বলো তো! মেয়ের কাছে বাবার আবার কিসের অনুরোধ? আদেশ করো। তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো আমি।'

'কথা দিচ্ছো!'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি। এখন বলো।'

'আমি জানি, তুমি আমার কথা রাখবে। শোন, আমি তোমার বিয়ে ঠিক করে রেখেছি। আজ রাতেই তোমাকে বিয়ে দিতে চাই। সবকিছুর আয়োজন ঠিক করা আছে।'

বাবার কথায় মিথিলার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। ও হতভম্ব হয়ে যায়। আহত কণ্ঠে বলে,

'বাবা! এ সব কী বলছো তুমি!'

'মা, যোগ্য ছেলের সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। ওদের কথা দিয়েছি।'

'তাই বলো, তোমার এই অবস্থায় আমার বিয়ে! কেন?'

'আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, মা। তাই তোমার বিয়ে দেখে যেতে চাই।'

'না, বাবা, না। এ হয় না!'

'তুমি কথা দিয়েছো মা। তুমি এখন না করো না। তাহলে আমি কষ্ট পাবো।'
এ পর্যন্ত বলে শফিক রহমান খুক খুক করে কাশতে লাগলেন। অসুস্থ বাবার বিছানায় বসে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লো মিথিলা। ওর বাবার অবস্থা আরো অবনতি হলো। মিথিলা নিজের বিবেক আর ভালোবাসার দায়বদ্ধতার নানা প্রশ্ন নিয়ে গোলক ধাঁধায় যেন হারিয়ে গেল। ঘটা করে না হলেও ওদের বাড়িতে মিথিলার বিয়ের আয়োজন চলছিল। সবকিছু হচ্ছিলো যেন চুপিচুপি। সেদিন মিথিলার ওর বাবার সঙ্গে আর কথা হয়নি। বাবার বিছনা থেকে ওঠে এসে ও নিজের রুমে গিয়ে বসে রইলো প্রায় পাঁচ ঘন্টা। এ সময় পর্যন্ত ওকে কেউ ডাকেনি। মা আসেননি ওর সামনে। ব্যাপারটা কেমন অবিশ্বাস্য লেগেছে ওর। সন্ধ্যা নামার পর কাজের মেয়ে জরিনা এসে ওকে বললো,
'আপা, রেজা নামে একজন আফনের সঙ্গে দেখা করতে আইছেন।'
রেজার নাম শুনেই ওর বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগলো। রেজা কেন হঠাৎ ওদের বাড়িতে এলো এই প্রশ্নটা মনে উঁকি দিতেই ওর মনে হলো ওর খোঁজে রেজার কুমিল্লা পর্যন্ত চলে আসাটা অসম্ভব নয়। মিথিলা ভাবতে লাগলো ও এখন কি বলবে রেজাকে। রেজা নিশ্চয় ওর বিয়ের কথা শুনে ভেঙে পড়বে। একদিকে মৃত্যু পথযাত্রী বাবার অনুরোধ, অন্যদিকে ভালোবাসার দায়। কোনদিকে যাবে ও? এই প্রশ্নের জবাব হাতড়ে খুঁজতে খুঁজতে উদ্বেগ ভরা দৃষ্টিতে মিথিলা জরিনার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো,
'তাকে আমার রুমে নিয়ে আস।'
'জে, আচ্ছা।'
জরিনা চলে গেল। মিথিলা নিজেকে তৈরি করে নিতে লাগলো। ও জানে না, কি বলবে রেজাকে। রেজাকে ফিরিয়ে দেয়া ছাড়া ওর কোন পথ নেই-এটাই ওর মনে হচ্ছিলো তখন। ঝড়ের গতিতে রেজা ঢুকলো ওর রুমে। ওর চোখে মুখে গভীর উদ্বেগ। মিথিলার দিকে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে রেজা বললো,
'কী ব্যাপার, আমাকে একটা ফোন না করে, তুমি ঢাকা থেকে কুমিল্লায় চলে এলে!'
'তুমি কীভাবে জানলে যে, আমি কুমিল্লায় এসেছি? তুমি কেনো এসেছো?'
'ফোনে তোমাকে না পেয়ে তোমার খোঁজে তোমার হোস্টেলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে জানলাম, জরুরি কারণে তুমি কুমিল্লায় চলে এসেছো। তাই আমিও চলে এলাম।
'ওহ্, আচ্ছা।'
'কিন্তু তোমাদের বাড়িতে এসে এ সব কী শুনছি!'
'কি শুনেছো?'
'আজ নাকি তোমার বিয়ে?'
এই প্রশ্ন শুনে চুপ করে রইলো মিথিলা। রেজা তাগিদ দিলো,
'কথা বলছো না কেন? তোমাদের কাজের মেয়ে যা বললো, তা কি সত্যি?'
'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো।'
ছোট্ট করে বললো মিথিলা।

‘তুমি বিয়ে করছো! সত্যি!’
‘করছি নয়, করতে হচ্ছে।’
ক্লান্ত ও নিস্প্রাণ গলায় বললো মিথিলা। আরো বিস্মিত কণ্ঠে রেজা বললো,
‘মিথিলা!’
‘হ্যাঁ, রেজা, এটাই সত্যি।’
‘এমন তো হবার কথা ছিল না! তুমি তো কথা দিয়েছিলে..!’
‘অনেক সময় চাইলেও কথা রাখা যায় না, রেজা। মানুষের অনেক দায়বদ্ধতা আছে।’
‘দায়বদ্ধতা?’
‘হ্যাঁ, দায়বদ্ধতা।’
‘ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাটা দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে না?’
‘পড়ে।’
‘তাহলে একটি দায়বদ্ধতা ভেঙে আরেকটি দায়বদ্ধতা রক্ষা করছো?’
‘আমি প্রতিশ্রুতি ভেঙে একজনকে কষ্ট দিচ্ছি। অপরদিকে পরিবারের সকলকে খুশি করতে পারছি।’
‘নিজে খুশি হতে পারছো?’
কোনও জবাব দিল না মিথিলা। একটু চুপ থেকে আহতকণ্ঠে রেজা বললো,
‘জানতে পারি, আমাকে এভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার মধ্যে তোমার কী অর্জন হলো।’
মিথিলা কোন জবাব দিল না। ও মাথা নিচু করে রইলো। রেজা ফের বললো,
‘বললে না, তোমার কী অর্জন হচ্ছে?’
মিথিলা জানে, রেজা ওকে প্রশ্ন করেই যাবে। ওর নিজেকে প্রস্তুত করে বললো,
‘আমার কোনও অর্জন নেই। তা নিয়ে ভাবছিও না। শুধু আমি আমার অপরাগতাকে ভাগ্যের খন্ডব দাহন বলে মেনে নিচ্ছি। এর বেশি কিছু আর বলতে পারছি না, রেজা।’
‘চমৎকার!’
‘তুমি ফিরে যাও। আমাকে অভিশাপ দিও।’
‘আরো চমৎকার! তোমাকে অভিশাপ দেব!’
‘হ্যাঁ, অভিশাপ দিও। আর কি বলবো?’
‘অভিশাপ! অভিশাপ দিলেই বুঝি জীবনের সবচেয়ে বড় গ্লানি, সবচেয়ে বড় পরাজয়ের কষ্ট মুছে যায়! তুমি কি তাই বলতে চাচ্ছো?’
‘তোমাকে সান্তনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। আমি যা বলছি, তা তো স্পষ্ট করেই বলছি।’
‘আমি তোমার মুখের কথা নয়, তোমার স্পষ্ট মনোভাব জানতে চাচ্ছি।’
‘তুমি এতো কিছু জানতে চাচ্ছো কেনো?’
‘কারণ, নিশ্চিত হবার জন্য। আজ যে কথাগুলো বলছো, তা যেন সময়ের ভুলের কাঁটা হয়ে না থাকে, তা স্পষ্ট করে বুঝে নেবার চেষ্টা করছি।’

রেজার কথায় বিব্রত হয়ে যায় মিথিলা। ওর ভেতরে অপরাধবোধ তীব্র হতে থাকে। ও বলে,
‘তুমি ফিরে যাও, রেজা!’
বুকের ভেতর ভীষণ তোলপাড় সহে রেজা আকুত ভরা গলায় বললো,
‘এতো সহজে এমন সম্পর্ক ভেঙে দেয়া কি ঠিক হচ্ছে, মিথিলা!’
‘বললাম তো, এর জন্য আমাকে অভিশাপ দিও।’
‘যদি তোমার নিজের বিবেক তোমাকে প্রশ্ন না করে, যদি তোমাকে কষ্ট না দেয়, তাহলে আমার অভিশাপ তোমাকে কী দেবে? কতটুকু পোড়াবে?’
‘আমি, আমি আর কিছু বলতে পারছি না, রেজা! আমাকে ক্ষমা করো, প্লিজ!’
‘আশ্চার্য! প্রতিশ্রুতি ভাঙবে, ফিরিয়ে দেবে, আর কথা বলবে না, তা কেনো?’
‘কারণ, আমি অপরাধী।’
‘স্বীকার করছো?’
‘স্বীকার করবো না কেনো? আমি জানি, আমার অপরাধের কোন ব্যাখ্যা নেই। আমাকে তুমি ঘৃণা করো! আমি ঘৃণার যোগ্য!’
‘চমৎকার! নিজের অবস্থানও ঠিক করে রেখেছো?’
‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে ঘৃণা করো। সেখানেই আমার অবস্থান।’
‘তোমাকে ঘৃণা করতেও আমার কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ করুনা হচ্ছে!’
‘আমি জানি, তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। সেটাই আমার প্রাপ্য।’
‘এখন মনে হচ্ছে, তুমি ঘৃণারও অযোগ্য!’
এ কথারও কোনও জবাব দিতে পারলো না মিথিলা। রেজা আবেগ জড়ানো গলায় বললো,
‘আমি বিশ্বাস করতাম, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার যেমন সম্পর্ক, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কও তেমনি। আমরা কতবার বলেছি, আত্মার সম্মিলনে আমরা অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু আজ এই বিশ্বাস, কাঁচের ঘর ভাঙার মত ভেঙে দিলে তুমি! এই জন্য তোমাকে অভিবাদন।’
‘কেনো?’
‘জীবনে এমন দগদগে ঘা সৃষ্টি করার জন্য। মানুষের চরিত্রের এমন নোংরা রূপ চিনিয়ে দেবার জন্য।’
‘তুমি তো ভালো চাকরি করছো। বই পড়ো। সংস্কৃতবান। ধৈর্য্যশীলও। আমি জানি, তুমি এই যাতনা সহে নিতে পারবে। আমাকে ঘৃণা করার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনও ঘুছিয়ে নিতে পারবে।’
নিজের ভেতর থেকে উথলে বেরিয়ে আসা কান্নাকে সামলে নিয়ে কথাগুলো বললো মিথিলা। ওর কথায় রেজা একটু মুচকি হাসলো। বললো,
‘তাই নাকি! তুমি সে দিকটা-ও বিবেচনা করে রেখেছো! তোমার এইটুকু দয়ার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো।’
‘আমি জানি, তুমি আমার কথাকে পরিহাস করছো। সেটাই স্বাভাবিক।’
‘পরিহাস আমি করছি! সবচেয়ে বড় পরিহাস তো তুমিই করছো!’

‘আগেই বলেছি, এ আমার অপরাগতা।’
‘অপরাগতা শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়েই কি একটি জীবনের স্বপ্ন প্রদ্বীপ এক ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়া যায়? একটি হৃদয়ের আকুতি মাড়িয়ে, সেখানে রক্তক্ষরণ বইয়ে দেয়া যায়! আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো তো?’
‘আমি তোমার চোখের দিকে তাকাতে পারবো না। আমার সেই শক্তি নেই!’
‘কারণ, তুমি অপরাধী।’
‘ঠিক।’
‘তুমি প্রতারক, ভন্ড!’
‘ঠিক।’
‘তুমি নিচ, লালসাগ্রস্থ নোংরা মনের নারী!’
‘আর কিছু বলবে?’
‘না। বলার মত আর কি থাকতে পারে?’
‘ঠিক আছে, এবার তুমি যাও! প্লিজ!’
মিথিলার কথায় মূষড়ে পড়েও রেজা এবার বিনীতভাবে বললো,
‘যাবার আগে, শেষবারের মত একটি প্রশ্ন করতে চাই।’
‘বলো।’
‘তুমি কি সত্যিসত্যিই বিয়ে করছো?’
‘হ্যাঁ। বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে হচ্ছে আমাকে। আমি তাকে কথা দিয়েছি, রেজা।’
এ কথা বলে ঠুকরে কেঁদে উঠলো মিথিলা। রেজা একটু হচকিত হলো। ওর ভেতরটা ভেঙে যাচ্ছে। ভীষণ প্রলয় হচ্ছে। ও নিজেকে সামলে নিতে পারছে না। ও কিছুক্ষণ চুপ থেকে থমথমে গলায় বললো,
‘এরপর তোমাকে ঘৃণা করাই আমার উচিত। কিন্তু আমি তা করবো না। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।’
‘কেনো!’
‘জেনো, সব মেনে নিয়ে ক্ষমা করে দেয়াটাই তোমার প্রতি আমার প্রতিশোধ!’
এ কথা বলে আর দাঁড়ায়নি রেজা। ঝড়ের মতই ও বেরিয়ে গিয়েছিল। মিথিলা শুধু অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, নিঃশব্দে, একাকী। সেই কান্নার মূর্ছনা আজো মিথিলাকে গ্রাস করলো। বিছানায় শুয়ে মিথিলা দু’চোখের পাতা এক করে ফেললো। ওর বন্ধ চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো জলের ধারা।

ছয়.

রাহাতের চোখ যেনও ক্যামেরা হয়ে গেছে। ও যা দেখে তা ক্যামেরার ফ্রেমের মধ্য দিয়ে দেখে। চোখের সামনে দৃশ্যমান যে কোনও কিছু কোনও ফ্রেমে ভালো লাগবে তা-ই ওর মাথায় কাজ করে। ও হয়তো ক্ষেতের আইল ধরে হাঁটছে। ক্ষেতে কর্মরত কৃষক হয়তো ওর

দিকে তাকিয়ে হাসলো, তখন ওর মনে হবে এই দৃশ্যটা ক্লোজশটে চমৎকার হবে। হয়তো সবুজ ধান ক্ষেতে ঢেউ তুললো দামাল বাতাস, তখন ওর মনে হবে এটি লং শটে টেক করলে চমৎকার হতো। রাহাতের এই অভ্যাস হয়েছে নাটক নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে। ও ঢাকায় একটি প্রোডক্টশন হাউজে কাজ করছে। ওর পজিশন সহকারী পরিচালক। কাজ করছে নাট্য নির্মাতা শহিদুল ইসলাম মিন্টুর সঙ্গে। ওদের একটি ধারাবাহিক নাটক অনএয়ার হচ্ছে এক স্যাটালাইট টিভিতে। নাটকের পর্ব শেষ হলে টাইটেলে রাহাতের নাম দেখা যায়। টিভি পর্দায় যখন ওর নাম ভেসে ওঠে, তখন গর্বে ভরে যায় ওর বুক। এই নাট্য জগতটা ভীষণ আকর্ষণীয়। এই জগতে সবাই যেতে পারে না। আবার এ লাইনে অনেকে গেলেও সবাই জায়গা করে নিতে পারে না, এটা জানে রাহাত। এ লাইনে টিকে থাকতে হয়। এখানে টিকে থাকাটাই বড় কথা। তিন বছর যাবত ও মনে প্রাণে লেগে আছে। রাহাতের স্বপ্ন ও একদিন পরিচালক হবে। ঢাকায় নাট্য পাড়ায় ইতিমধ্যে ওর একটু পরিচিত হয়েছে। নাটক করতে আসা নতুন নতুন ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে ও সালাম পায়। ওর ভালো লাগে। রাহাত এখন দাঁড়িয়ে আছে গুকসির বিলের সামনে। এই বিলের সামনে দাঁড়িয়ে ও ভাবছিলো, বিলটিতে একটি নৌকা বাইচের আয়োজন করলে ভালো হতো। এই নৌকা বাইচ তিন ক্যামেরায় শুট করতে পারলে এক্সসিলেন্ট দৃশ্য ধারণ করা যেত। দৃশ্যটা ও কল্পনা করে নিল। নায়ক নৌকা বাইচে অংশ নিয়েছে। প্রায় তিরিশটি নৌকা ছুটছে। এরমধ্যে নায়কের নৌকাটি সাবার আগে ছুটছে। বিলের পাড়ে গ্রামের শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে এই প্রতিযোগিতা। ঢাক-ঢোল বাজছে। সবাই চিৎকার করছে। এদের মধ্যে নায়িকাও রয়েছে। সে হাততালি দিয়ে নায়ককে সমর্থন দিচ্ছে। প্রতিযোগিতার এক সময় নায়কের নৌকাটি মাঝপথে পানিতে ডুবে যেতে থাকবে। নায়িকার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসবে আর্ত চিৎকার। এই পর্যন্ত ভাবলো ও। এমন দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি করতে হলে একটি ক্যামেরা সার্চ করবে বিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামবাসীর উপর। নায়িকার মুখটি বারবার ক্লোজ শটে আসবে। নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা লং শটে নিতে হবে। আবার নায়ককে নিতে হবে ক্লোজ শটে। হেলিকপ্টার দিয়ে উপর থেকে কয়েকটা শট নিতে পারলে খুবই ভালো হবে। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। একটি নাটকে এতো টাকা কখনো কেউ ব্যয় করে না। ভেবে নিল রাহাত। যে কোনও স্থানে, যে কোনো সময় ও নাটকের মধ্যে ঢুকে যায়। ও তন্ময় হয়ে গুকসার বিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে নৌকা বাইচের কথা ভাবছিল। ওর ভাবনা ভেঙে দিল লিজি। লিজি বিলের পাড় ধরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলো। বিলের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকা রাহাতকে দেখে লিজি সাইকেল থামিয়ে দিল। রাহাতের খুব কাছ থেকে লিজি জিজ্ঞেস করলো,

‘হ্যালো, আপনি রাহাত না!’

লিজির কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে রাহাত বিলের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ালো। ও লিজিকে দেখে বিস্ময়ে থ’ হয়ে গেল। লিজির কপালে কৌতুহলের ভাঁজ পড়লো। বললো,

‘হোয়াট ডিড ইউ সিন? হ্যাড ইউ ইমপ্রেসড? বিলের নীরবতার সৌন্দর্য দেখছিলেন, বুঝি!’

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রাহাত শুধু বললো,
‘আপনি, এখানে!’
‘স্ট্র্যাঞ্জ! আমি কি এখানে আসতে পারি না!’
এ কথা বলে মিষ্টি করে হাসলো লিজি। রাহাত ওর হাসির মাদকতায় ইমপ্রেসড হয়ে গেল। বললো,
‘না, আমি ভাবতেই পারছি না, আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন?’
‘কেনো? আমি তো অন্য গ্রহ থেকে আসিনি। এই গাঁয়েই তো আছি। দেখা তো হতেই পারে।’
‘হতে পারে। কিন্তু আমি সত্যিসত্যি ভাবিনি আপনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।’
‘বাই দ্যা ওয়ে, আপনি এখানে কি করছিলেন?’
‘আমি এখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এখানে শ্যূটিং করবো। অর্থাৎ নাটক বানাবো।’
‘নাটক?’
‘হ্যাঁ, নাটক। আপনি কি নাটক দেখেন? আই মীন বাংলা নাটক?’
রাহাতের এ কথায় না হেসে পারলো না লিজি। ও হাসতে হাসতে বললো,
‘আপনার কি ধারনা নিউইয়র্কে যারা থাকেন, তারা বাংলা নাটক দেখেন না? ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, নিউইয়র্কে অনেক বাঙালির বাসায় বাংলা ভাষার টিভি আছে। এ ছাড়া তারা নাটকের ক্যাসেট ভাড়ায় বা কিনে দেখেন।’
‘না, জানতে চাচ্ছিলাম, আপনি দেখেন কিনা?’
এবার একটু বিব্রত হলো লিজি। ও নাটক খুব একটা দেখে না। লিজি নিঃসঙ্কোচে বললো,
‘না, আমি বাংলা নাটক খুব একটা দেখি না। কিন্তু কেনও বলুন তো!’
এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রাহাত পাল্টা প্রশ্ন করলো,
‘আপনি কী সাঁতার জানেন?’
‘না, জানিনা। কেনো?’
‘ইস্! আপনি যদি সাঁতার জানতেন!’
‘কী হতো?’
‘একটি নাটকে চান্স দিতাম। আই মীন নায়িকা বানাতাম।’
‘নায়িকা!’
‘হ্যাঁ। নায়িকা। এখানে দাঁড়িয়ে চমৎকার একটা গল্পের প্লটও তৈরি করে ফেললাম।’
‘আপনি কি নাটক লেখেন, আই মীন ড্রামা!’
‘এখনো লিখিনি। তবে লিখে ফেলবো। মাথার মধ্যে লেখালেখি কিলবিল করছে। হা হা হা।’
‘আপনি আসলে কী করেন?’
লিজির এই প্রশ্নটা রাহাতের খুব ভালো লাগলো। গ্রামে আসার পর ঢাকায় ও কী কাজ করে, কেউ জিজ্ঞেস করেনি। ওকে নিজ থেকেই বলতে হয়েছে ঢাকায় ও কী করছে। কেউ প্রশ্ন না

করলে নিজের কাজের ব্যাপারে কথা বলার মধ্যে সঙ্কোচ লাগে। রাহাত লিজির দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিতভাবে বললো,
‘একটা প্রোডাক্টশন হাউজের সঙ্গে আছি। পদবীতে সহকারী পরিচালক। যেদিন পুরোপুরি পরিচালক হবো, সেদিন এই বিলের সামনে এসে সেট ফেলবো। গ্রামের সকল মানুষ অবাক চোখ তুলে দেখবে, রাহাত কতদূর গিয়েছে!’
লিজি রাহাতের দিকে চেয়ে রইলো। ওর দৃষ্টিতে মুগ্ধতা আছে, কি নেই তা বুঝতে পারলো না রাহাত। স্বপ্নের ঘোর থেকে নিজেকে বের করে এনে ও লিজির উদ্দেশ্যে বললো,
‘আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমার প্রথম নাটকে আপনাকে নায়িকা হিসাবে কাষ্ট করলে ভালো হবে।’
‘নায়িকা, আমাকে! রিয়েলি!’
এ কথা বলে লিজি হাসতে লাগলো। যেন রাহাত খুব একটা হাসির কথা বলে ফেলেছে। রাহাত বিব্রত হলো না। নাটকের জগতে এমন অবস্থায় একটু সিরিয়াস থাকতে হয়। রাহাত নিজের মধ্যে গাম্ভীর্য ধরে রেখে বললো,
‘জানেন, বাংলাদেশে প্রতিদিন কত লক্ষ মেয়ে নাটকের নায়িকা হবার স্বপ্ন দেখে?’
‘আই ডোন্ট নো। বাট হাউ মাচ? কুড ইউ টেল মি?’
‘কমপক্ষে দশ লক্ষ মেয়ে এই স্বপ্ন দেখে।’
‘স্ট্র্যাঞ্জ!’
‘জ্বি, সত্যি বলছি! বিশ্বাস হচ্ছে না?’
‘হচ্ছে। তা আমি কি করবো?’
‘কিছুই করতে হবে না। আপনি চাইলে আপনাকে আমি নায়িকা বানিয়ে দিতে পারি। ইফ ইউ ওয়ান্ট, আই ক্যান ডু ইট!’
লিজি ফের হাসলো। মুখে হাসি ধরে রেখে বললো,
‘ও সব আমি পারবো না। আমাকে দিয়ে হবেও না, বুঝলেন?’
‘কী বলেলন? ঐশ্বরিয়া রাইকে চিনেন?
‘হ্যাঁ। ও হচ্ছে মুম্বাইয়ের হার্টথ্রুব নায়িকা।’
‘ওর চৌদ্দ গোষ্ঠীর কেউ কখনো অভিনয় করেছে?’
‘তা তো জানি না!’
‘আমার কাছ থেকে শুনুন। ঐশ্বরিয়া অভিনয়ের অ-ও জানতো না। এখন দেখুন, অভিনয় দিয়ে পুরো বিশ্বটাকে জয় করে নিয়েছে। অক্ষয় কুমার হোটেলে ওয়েটারের চাকরি করতো। আজ অভিনয় দিয়ে কোথায় চলে গেছে? রাজেশ খান্না কথাই ধরুন, অভিনয় শেখার জন্য নাটকের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে কোনওদিন পাশ করেননি। কিন্তু তারপর? তারপর সেই লোকটিই অভিনয় দিয়ে ইতিহাস গড়েছেন বলিউডে। এ রকম অনেক উদাহরণ দিতে পারবো। আপনার ভয় নেই। আমি আপনাকে অভিনয় শিখিয়ে দেবো। অভিনয় কেউ শিখে আসে না। ভালো পরিচালকের হাতে পড়লে, ওটা এমনি এমনি হয়ে যায়।’

ক্লাশে ছাত্রকে শিক্ষক যেভাবে জ্ঞান দেন, সেভাবে কথাগুলো বললো রাহাত। লিজি ছোট্ট করে বললো,
‘কী যে বলেন!’
‘আপনি ভয় পাচ্ছেন? তারা কীভাবে স্টার হয়েছেন, জানেন?’
‘না।’
‘তারা ভালো পরিচালকের হাতে পড়েছিলেন বলে।’
লিজি বললো,
‘সরি, আমার ও সবে কোনও আগ্রহ নেই।’
লিজির কথায় রাহাত ভীষণ হতাশ হলো। এতো সুন্দর একটি মেয়ে নাটকে এলে আলাদা গ্লামারস ফুটিয়ে তোলা যেত। হৈ চৈ ফেলে দেওয়া যেত। অথচ লিজি না করছে। ও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, এ সময় লিজি বললো,
‘আমার নাটক করার কোনও ইচ্ছা নেই। নাটক আমি তেমন বুঝিনা, পছন্দও করি না। নিউইয়র্কে আমি একবার মাত্র ম্যানহাটানের ব্রডওয়েতে নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। ভীষণ বোরিং লেগেছে। মঞ্চের মধ্যে হৈ চৈ, গলাবাজি আর ন্যাকা কান্না! আমার শিল্পবোধ নিয়ে আমি নিজেই শঙ্কিত।’
লিজির কথায় হতাশা বাড়তে লাগলো রাহাতের। তবে ও হাল ছাড়তে নারাজ। ও বললো,
‘ঠিক আছে, তারপরও আপনাকে নায়িকা বানাবো।’
‘এরপরও! কেনো?’
‘এই কেনোর উত্তর আপনি পরে বুঝতে পারবেন। একদিন দেখবেন, অটোগ্রাফ শিকারীর জ্বালায় রাস্তায় হাঁটতে পারবেন না।’
লিজি খিলখিল করে হেসে ওঠলো। রাহাত ওর হাসির সামনে মুগ্ধ হয়ে গেল। ও ভাবতে লাগলো লিজির এমন প্রাণ খোলা হাসিটা ক্যামেরা জুম করে ক্লোজ শটে নিলে অদ্ভূত একটা সুন্দর দৃশ্য হবে। হাসি সামলে নিয়ে লিজি বললো,
‘বাই দ্যা ওয়ে, আমি একজনকে খুঁজছি। লোকটি নাকি এই বিলের দিকে এসেছেন। আপনি এদিকে কাউকে দেখেছেন?’
‘কেমন লোক বলুন তো!’
‘রহস্যময় এক লোক। কথা খুব কম বলেন। কারো দিকে তাকান না, এই ধরনের লোক।’
‘ওহ্, বুঝতে পেরেছি। আপনি নৈশ্য স্কুলের শিক্ষক আবিদের কথা বলছেন?’
‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কথাই বলছি। তাকে দেখেছেন?’
‘দেখেছি। ঐ পাগলটা এদিকে এসে একটা নৌকা খুঁজছিলো।’
রাহাতের কথায় প্রতিবাদের সুরে লিজি বললো,
‘দেখুন, সে পাগল নয়!’
‘কিন্তু...?’
‘আপনারা তাকে চিনতে পারছেন না। বাই দ্যা ওয়ে, সে কোনদিকে গিয়েছে বলুন তো!’

‘ঐ দিকে।’

রাহাত বিলের পাড়ে দূরে গোবিন্দপুর গ্রামের দিকে আংগুল দিয়ে দেখালো। লিজি সেদিকে তাকিয়ে বললো,

‘ধন্যবাদ। আমি আসছি। তাকে ধরতে হবে।’

লিজি সাইকেলের প্যাডেলে পা চালালো। সাইকেলটা চলতে শুরু করলো। রাহাত হাত নেড়ে শুধু বিদায় জানালো লিজিকে। ওর মুখে কোন কথা ফুটলো না। ওর মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল। একটা পাগল লোকের জন্য লিজির এই টান ভালো লাগলো না রাহাতের। ও কেমন একটা নাটকের গন্ধ পাচ্ছে। বিলের পাড়ে মন খারাপ করে রাহাত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। শান্ত বিলের নীরবতার মধ্যে ওর নিজের না বলা কথাগুলো যেনও মিলিয়ে গেল।

সাত.

বিলের শান্ত জলের এক ধরনের ভাষা আছে। নীরবতার যেমন ভাষা আছে, শান্ত জলেরও তেমনি একটা ভাষা আছে। এই ভাষা সবাই পড়তে পারে না বা পড়তে চায় না। গুকসির বিলের জলে নৌকা চালানোর সময় আবিদ রেজার তাই মনে হলো। বিলের শান্ত জলের দিকে তাকিয়ে ও আজ উদাস হয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মের গুমোট বিকেল। বিলের শান্ত জলের উপর ছোট্ট ডিঙি নৌকায় চড়ে ও ভেসে বেড়াচ্ছে। নৌকার মাঝি ও নিজেই। আজ অনেকদিন পর ওর মনটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠেছে। একটা হাহাকার টের পাচ্ছে ও। আনন্দ বা বিষণ্নতা আজকাল ওকে তেমন স্পর্শ করে না। অথবা বলা যায়, আনন্দ বা বিষণ্নতাকে ও নির্মোহভাবে উপেক্ষা করে চলে। কিন্তু আজ ওর মনটা হেরে গেছে। নিজের ভেতরের একটা অস্থিরতা নিয়ে আবিদ চলে এসেছিল বিলের পাড়ে। বিলে মাছ ধরছিল ধীরেন জেলে। ও ধীরেন জেলের কাছ থেকে নৌকাটি চাইতেই সে হাসিমুখে নৌকাটি তাকে দিয়ে দেয়। আবিদ বুঝতে পারে ওকে গ্রামের প্রায় সকলে পছন্দ করে। ওকে নৌকা দিতে দ্বিধা করেনি ধীরেন জেলে। তবে আবিদ নৌকা চালাতে পারবে কিনা, এ নিয়ে ধীরেন জেলে সন্দিহান ছিল। আবিদ যখন স্বাভাবিকভাবে নৌকার বৈঠা চালালো, ধীরেন জেলে তখন স্বস্থি পেল। সে চলে গেল নিজের বাড়ির দিকে। আবিদ বৈঠা চালিয়ে নৌকো নিয়ে চলে এলো বিলের মাঝখানে। শান্ত বিলের নিঃসঙ্গতার সঙ্গে ও যেন নিজের কিছু একটা খুঁজছে। বিষণ্ন বিকেলের এই বিল আবিদকে নিয়ে গেল অদ্ভূত সুন্দর এক বিকেলের কাছে। মনের প্রবল আপত্তি ও অনিচ্ছা সত্বেও মনের পর্দায় ভেসে উঠলো স্মৃতিতে উজ্জ্বল সেই বিকেলের কথা। সেই বিকেলটি পেখম ছড়িয়ে ছিল এমনি একটি বিলের উপর। সে বিকেলটি স্মৃতির সোনালী ফ্রেমে বাঁধা। আবিদ রেজার জীবনের প্রথম রোমান্টিক বিকেল ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ঐ বিকেলটি তিনটি কারণে ওর জীবনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এক হচ্ছে এদিন ও প্রথম কোনও মেয়েকে নিয়ে আশুলিয়ায় বিলের পাড়ে ঘুরতে গিয়েছিল। দু’ হচ্ছে এদিন ও প্রথম কোনও মেয়েকে প্রপোজ করেছিল এবং তিন হচ্ছে মেয়েটি ওর প্রপোজকে প্রশ্রয় দিয়েছিল।

এই জন্য ঐ বিকেলটিকে আবিদ রেজার কাছে হিরন্ময় এক বিকেল বলে মনে হয়। মিথিলাকে নিয়ে প্রথম ঘুরতে যাওয়া, প্রথম ভালো লাগার কথা বলার যে উপখ্যান ও চেপে রেখেছে মনের অন্তপুরে, তা এই মুহূর্তে ওর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠলো।

বর্ষাকালে ঢাকার অদূরে আশুলিয়ায় ভিড় জমায় চিত্ত বিলাসীরা। এখানে বর্ষার পানিতে ফসলের ঢালু মাঠ পরিণত হয় বিশাল বিলে। এই বিলের পাড়ে নগর জীবনের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলতে ছুটে আসেন নানা বয়সের মানুষ। পাঁচ বছর আগে আবিদ রেজা আশুলিয়ার বিলের পাড়ে ছুটে গিয়েছিল মিথিলাকে সঙ্গে নিয়ে। মিথিলা ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আবিদ রেজার ওপর ভর করেছিল কবি সত্ত্বা। সেদিন এক পর্যায়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে মিথিলা তন্ময়তার মধ্যে ওর কাছে প্রশ্ন করেছিলো,

‘বলতে পারেন, আকাশ নীল কেনো?’

‘খুব সহজ। আকাশ জুড়ে রয়েছে আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্নের রঙ নিয়েই আকাশের নীল হবার অহংকার। এ ছাড়া আকাশের কোনও রঙ নেই। অহংকারও নেই।’

‘সত্যি!’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি ভালোই রসিকতা করতে পারেন।’

‘রসিকতা নয়। সত্যি বলছি।’

ওর কথায় খুব হেসেছিলো মিথিলা। কিন্তু ওর কথা মিথিলার ভালো লেগেছিল। ও একটু হেসে চোখের মণিতে কৌতুহল নাচিয়ে প্রশ্ন করেছিলো,

‘এবার বলুন তো, দিগন্তের রেখা কালো কেনো?’

আবিদ রেজা প্রস্তুত ছিলো। ও কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর দিচ্ছে এমন ভাব করে বলেছিলো,

‘ওখানে জমে থাকে আপনার গোপন কষ্ট। তাই দিগন্তের রেখা কালো দেখা যায়।’

‘গ্রীষ্মে হাওয়ার এমন মাতম কেনো?’

‘হাওয়াকে তাড়িয়ে বেড়ায় আপনার দীর্ঘশ্বাস।’

‘বৃষ্টি ছন্দময় কেনো?’

‘বৃষ্টিতে মিশে থাকে আপনার অপ্রকাশিত আবেগ’।

‘সমুদ্রের এতো গর্জন কেনো?’

‘সমুদ্র জানতে চায় আপনার না বলা কথা। তাই ওর এতো গর্জন।’

‘শিশুরা সরল হয় কেনো?’

‘ওরা আপনার হাসির মুদ্রার স্বরলিপি জানে।’

‘কবিরা এতো রোমান্টিক কেনো?’

‘ওরা প্রেমকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দেন।’

‘আপনি সত্যিই কথা জানেন। অর্থাৎ কথা বানাতে পারেন।’

এ কথা বলে মিথিলা হাসিতে লুটিয়ে পড়ছিলো। মিথিলার হাসির জবাবে ও মিটিমিটি হেসেছিলো। মিথিলার হাসি থামার পর ও বলেছিলো,

‘আমি কিন্তু কথা বানিয়ে বলতে পারি না। তবে আপনার সামনে এলে আমার মধ্যে কথার মাদকতা তৈরি হয়। কথার জাল বুনতে থাকে।’
‘তাই নাকি!’
‘হুম্। আপনি কাছে এলেই আমার ভেতরে কে যেনও কথা বলে ওঠে। আপনি প্রশ্ন করলে আমার ভেতর থেকে উত্তর দেয় অন্যকেউ। আর আপনি যখন থাকেন না, তখন আমি স্বাভাবিক হয়ে যাই। আসলে আমি আপনাকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাই।’
‘বেশ তো! শুনেছি, মন্ত্রমুগ্ধরা প্রিয়জনের সামনে ভাষামূক হয়ে যান। আপনি দেখছি ঠিক এর উল্টো!’
‘ইদানিং আমার ইমোশন খুব বেশি প্রকাশ পাচ্ছে।’
অপরাধ স্বীকার করার মত বলেছিলো ও। মিথিলা কণ্ঠে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলো,
‘মনে হচ্ছে, আর কয়েকদিনের মধ্যে আপনি আমাকে প্রেম নিবেদন করে ফেলবেন!’
এ কথায় মিথিলার চোখে চোখ রেখেছিলো ও। এমন সরাসরি ও কখনো মিথিলার চোখে চোখ রাখেনি। মিথিলা একটু কেঁপে উঠেছিলো যেনও। ও ভারী কণ্ঠে বলেছিলো,
‘প্রেম আমার কাছে নিবেদনের বিষয় নয়, মিথিলা!’
ওর কণ্ঠে ‘মিথিলা’ নামটি এমনভাবে উচ্চারিত হয়েছিলো যে, মিথিলা কয়েকটা মুহূর্ত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। মিথিলা আড়ষ্ট গলায় বলেছিলো,
‘ঠিক বুঝলাম না।’
ও হালকা করে একটু হেসেছিলো। বলেছিলো,
‘আমি বলতে চাচ্ছি, আমার কাছে ‘প্রেম’ নিবেদনের বিষয় নয়। ওটা সমর্পনের। প্রেম নিবেদন করাটা আমার কাছে আপেক্ষিক ব্যাপার বলে মনে হয়। আমি মনে করি, প্রেম স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নেবে এবং তা সমর্পিত হয়ে যাবে। যা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে না। আমারও হয়েছে তাই।’
‘হয়েছে তাই মানে!’
মিথিলা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলো। ও আর কালক্ষেপণ না করে না বলা কথাটি সহজভাবে বলে ফেলার মত করে বলেছিলো,
‘বলতে চাচ্ছি, আপনার প্রতি আমার সর্বস্ব সমর্পিত হয়ে গেছে।’
এ কথায় ভীষণ লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল মিথিলা। মানুষের জীবনে কিছু কিছু মুহূর্ত আসে, যখন সে নিজের আবেগকে ধরে রাখতে পারে না। মিথিলারও তাই হয়েছিলো। ও আবেগ জড়িত গলায় জানতে চেয়েছিলো,
‘তাহলে এটার নাম কি হবে?’
মিথিলার এ কথায় বুকের উপর চেপে থাকা অনড় পাথর নেমে গিয়েছিলো যেনও। ও আবেগ মথিত কণ্ঠে বলেছিলো,
‘এটার নাম দিতে চাই ‘প্লাটনিক লাভ।’

এ কথায় খিলখিল করে হাসির দমকায় ভেঙে পড়েছিলো মিথিলা। ওর হাসি থামছিলো না। মিথিলা এমনভাবে হাসছিলো, ঐ মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছিলো ভালোলাগারও অতুলনীয় মহত্ব আছে। যদিও মিথিলার হাসির কোনও অর্থ ও বুঝতে পারছিলো না। বিশেষ একটা মুহূর্তে মেয়েরা এমনভাবে হাসবে যে, এই হাসির সঠিক ব্যাখ্যা বের করা কঠিন। মনে হবে হাসির মধ্যে প্রশ্রয় থাকতে পারে, আবার উপেক্ষাও থাকতে পারে। মিথিলা'র হাসিতে ঐ রকম একটা ছবি দেখতে পেয়েছিল ও। ওর ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে মিথিলা এক সময় হাসি সামলে নিয়েছিলো। ও মিথিলার কাছে থেকে একটা জবাব আশা করছিলো। মিথিলাও সেটা বুঝতে পেরেছিলো যেনও। মিথিলা ওর চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলেছিলো,
'প্লাটনিক লাভ, না ছাই! আমি এর নাম দিচ্ছি একতরফা মোহ বা সস্তা আবেগ!'
এ কথায় তাৎক্ষণিকভাবে ভীষণ হতাশ হয়েছিলো ও। একতাল লজ্জায় ও কুকড়ে গিয়েছিলো। ওর দিকে তাকিয়ে ফের মিথিলা হাসির দমকায় ভেঙে পড়েছিলো। সেদিন থেকেই ওর সঙ্গে মিথিলার সম্পর্কের একটা অর্থপূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছিলো। যা পরবর্তীতে প্রহসনে পরিণত হয়। সেদিনের স্মৃতি মনে করে আবিদ রেজা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। এই দীর্ঘশ্বাস বিলের শান্ত জলে ঢেউ না তুললেও ওর মনে গোপন কান্নার ঢেউ বইতে লাগলো। ও নিঃসঙ্গ বিলের হাহাকারের সামনে নিজের হাহাকার সামলে রাখতে পারলো না। অনেক চেষ্টা করেও সামলে রাখতে পারলো না দু' চোখের জলপ্রপাত।

আট.

মিথিলা প্রতিমাসে একবার দেখা করে রেজার মায়ের সঙ্গে। দু'টো কারণে তার সঙ্গে দেখা করে ও। রেজা বাড়ি ফিরেছে কিনা তা জানার জন্য এবং আরেকটি কারণ হচ্ছে ওকে দেখলে রেজার মা খুব খুশি হন। মিথিলাকে দেখলে তিনি খুশিতে ওকে জড়িয়ে ধরেন। কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে রেখে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। যতবার মিথিলা তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, ততবারই তিনি তাই করেছেন। মিথিলা কাঁদতে চায়না। কিন্তু কান্না যেন সংক্রামক ব্যাধি। যতবার রেজার মা ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন, ততবার মিথিলাও কেঁদেছে। তাদের মধ্যে আর বিশেষ কোন কথা হয়না। কান্নাই তাদের ভাষা। প্রতিমাসে মিথিলা যায় রেজাদের বাড়ি এবং ওর মায়ের সঙ্গে কান্নাকাটি করে বাড়ি ফিরে আসে। একজন পুরুষ মানুষের জন্য দুটি অবস্থানের দু'জন নারী অপেক্ষা করছে এবং তারা কাঁদছে। কিন্তু ঐ মানুষটির কোন হদিস তারা পাচ্ছে না। মা এবং প্রেমিকার ওই সম্মিলিত কান্না, আলাদা বেদনার খবর কি জানে রেজা? প্রশ্নটি মাঝেমাঝে মিথিলার মনে উঁকি দেয়।
রেজাদের বাড়ি ঢাকা শহরের ভূতের গলিতে। আগে ওদের বাড়ি আসতে মিথিলার ভয় করতো। মনে হতো ভূতের গলিতে সারি সারি ভূত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এখানে সারি সারি ভবন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তবে রাস্তাগুলো সরু। ভবন ঘেরা এমন ব্যস্ত এলাকায় ভূত থাকার জো নেই। প্রথম দু'বার আসার পর মিথিলার ভয় কেটে গেছে। এখন তো ভূতের গলি ওর কাছে খুব চেনা এলাকা। আজ রেজাদের বাড়ি এসে ওর মায়ের দেখা

পায়নি মিথিলা। ও রেজার বাবাকে কখনো দেখেনি। তিনি ভীষণ ব্যস্ত একজন ব্যবসায়ী। সংসারের কোন খোঁজ খবর তিনি নাকি রাখেন না বা রাখতে পারেন না। রেজাই ওকে এ কথা বলেছিল। ওর মা ঠিক এর উল্টো। সংসারকে তিনিই আগলে রেখেছেন। রেজার ছোট একটি বোন আছে। ওর বিয়ে হয়ে গেছে। রেজাদের ছোট্ট পরিবার। আজ রেজাদের বাড়ির গেটের সামনে মিথিলার রিকসা থামার সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান হারু মিয়া ওর উদ্দেশে বললো,

'আপা, আম্মা বাড়ি নাই। আপনারে এক হপ্তা পর আইতে কইছে।'

'বাড়িতে নেই মানে, তিনি কোথায় গিয়েছেন?'

রিকসায় বসে জানতে চাইলো মিথিলা। হারু মিয়া বললো,

'আম্মা খালুজানরে লইয়া খাজা বাবার দরবারে গেছেন।'

'মানে ভারতে?'

'হ। আম্মা বইল্যা গেছেন, আপনারে আরও এক হপ্তা পর আইতে।'

'ঠিক আছে। আমি এক সপ্তাহ পরে আসবো। এই রিকসা ঘুরাও।'

রিকসাওয়ালা রিকসা ঘুরিয়ে বললো,

'আফা, এখন কোথায় যাইবেন?'

'পান্থপথ যাও। বসুন্ধরা সিটি মার্কেটে।'

'ঠিক আছে।'

রিকসা চলতে লাগলো। মিথিলার মনটা এই মুহূর্তে বিষণ্ন হয়ে গেল। ও বুঝতে পারছে রেজার জন্য ওর মা আজমীর শরীফ গেছেন। ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য এক মায়ের কী বেদনা বিধূর অপেক্ষা! কতরকম চেষ্টা! অথচ রেজা কতটা নিষ্ঠুর, কতদিন যাবৎ নিরুদ্দেশ! ওর কি একবারও মায়ের কথা মনে পড়ে না? বাবার কথা মনে পড়ে না? একমাত্র বোনের কথা মনে পড়ে না? এভাবে হারিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে রেজা কার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে? কাকে কষ্ট দিতে গিয়ে আরও কাকে কাকে কষ্ট দিচ্ছে? ভাবে মিথিলা। ও না হয় অপরাধ করেছে। তাই বলে ওর মা-বাবা ও বোনের কী অপরাধ? রেজা কী এই কথা ভাবছে না? প্রশ্নগুলো মিথিলার মনে রংধনুর মতো ফুটে উঠলো। এই প্রশ্নগুলো প্রায়ই ওর মনে ছড়িয়ে থাকে। মিথিলার রিকসা ভূতের গলি থেকে বের হয়ে গ্রীনরোড দিয়ে পান্থপথের সামনে আসতেই রিনির ডাক শুনতে পেল মিথিলা। অপরদিক থেকে রিকসায় চড়ে আসছিল রিনি। ও মিথিলাকে দেখে উঁচু গলায় ডাকলো,

'এই মিথিলা! রিকসা থামা! মিথিলা!'

রিনির ডাক শুনে মিথিলা রিকসাওয়ালাকে রিকসা থামাতে বললো। রিনির রিকসা ঘুরে এসে থামলো ওর রিকসার সামনে। রিনি মিথিলার উদ্দেশে সোৎসাহে বললো,

'তোদের বাসায় যাচ্ছিলাম! আজ তোকে ভীষণ দরকার, বুঝলি!'

'কেন রে?'

'বলছি, বলছি। আগে উঠি তোর রিকসায়। তারপর বলছি।'

এ কথা বলে রিনি ওর রিকসাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মিথিলার রিকসায় উঠে বসলো। রিনি মিথিলার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। দু'জনেই ঢাকা মেডিক্যালের ছাত্রী। মেডিক্যালে থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় এক ইন্টার্নী ডাক্তারের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করে ফেলে রিনি। ফাইনাল পরীক্ষাটা ওর আর দেয়া হয়নি। ওর স্বামী এফআরসিএস করতে লন্ডনে গিয়ে এখনো ফেরেনি। ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা আছে, যোগাযোগটা তেমন নেই। কোথাও একটা ছন্দ পতন হয়েছে, বুঝতে পারে মিথিলা। রিনি ওর স্বামীর ব্যাপারে কোন কিছু বলতে চায় না। মিথিলাও জানতে চায়নি। কতজন কত অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছে। কত ধাঁধানো আলোর অন্তরালে কত গভীর অন্ধকার লুকিয়ে থাকে, কে জানে!
রিকসায় উঠেই রিনি বললো,
'জানিস, তোর জন্য আজ একটা সারপ্রাইজ আছে!'
'সারপ্রাইজ!'
'হ্যাঁ, সত্যি সত্যি সারপ্রাইজ!'
'বলে ফেল, শুনি।'
'এখনই বলছি না। তার আগে বল, তুই কোথায় যাচ্ছিলি?'
'বসুন্ধরা সিটি মার্কেটে। মন ভালো নেই। তাই ভাবলাম, একটু কেনাকাটা করি। তুই আমাদের বাসায় কেন যাচ্ছিলি?'
'ঐ যে বললাম তোর জন্য সারপ্রাইজ আছে। আমি তোকে বাসা থেকে আনতে যাচ্ছিলাম।'
'এখন কোথায় যাবি?'
'বসুন্ধরা সিটি মার্কেটেই। তিনতলায় একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে না, কী যেন নাম? ও, মনে পড়েছে, ওটার নাম কী যেন? ওখানে যাবো?'
'কী ব্যাপার, একেবারে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত যেতে হবে? কী এমন সারপ্রাইজ, বলতো শুনি! মনে হচ্ছে, খুব সিরিয়াস কিছু?'
'তোর জন্য সিরিয়াস কিনা জানি না, তবে.. ?'
'তবে কী?'
'রাশেদ ভাইয়া ওখানে তোর জন্য অপেক্ষা করছে।'
'আমার জন্য অপেক্ষা করছেন! কেন?'
'আজ তার জন্মদিন।'
'তাই নাকি!'
'হুম!'
'এতে আমার আবার সারপ্রাইজ কী?'
'আছে, আছে। চল, যেতে যেতে বলছি।'
'বিশেষ কিছু বলবি বলে মনে হচ্ছে?'
'সেরকমই।'
'খুলে বলতো!'

মিথিলা বিস্ময় প্রকাশ করে। রিকসা চলছে। রিনি মিথিলার দিকে মিষ্টি করে হাসলো। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার আগে রিনি মিষ্টি করে হাসে। এই হাসি মিথিলার চেনা। ও রিনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। রিনি একটু ভারী কণ্ঠে বললো,

'তুই কি বুঝতে পারিস না, রাশেদ ভাইয়া তোকে পছন্দ করে?'

রিনি এমন তীর্যক প্রশ্ন করবে, ভাবেনি মিথিলা। প্রশ্নটা শুনে ও একটু হচকিয়ে গেল। রিনি মিথিলার কোন জবাব আশা না করে বললো,

'আমি জানি, রাশেদ ভাইয়া যে তোকে পছন্দ করে, সেটা তুই জানিস। মেয়েরা এ ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারে। তবে অনেক মেয়ে এ ধরনের পছন্দকে প্রশ্রয় দেয় না। আমি জানি, তুই সে দলেরই একজন। ঠিক বলেছি?'

'হঠাৎ এ সব কথা বলছিস কেন!'

'বলছি, প্রয়োজনে। আমাকে বলতে হচ্ছে।'

'কেন?'

'সেটাই তো বলতে চাচ্ছি। রাশেদ ভাইয়া আজ তোকে প্রপোজ করতে চায়।'

'হোয়াট?'

'আহা, রাগছিস কেন!'

'রাগবো না? রাগের কথা বলছিস, আর আমি রাগবো না? কেন রাশেদ তোর ভাই বলে?'

ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো মিথিলা। রিনি গলা নামিয়ে বললো,

'আমি জানি, এ কথা শোনার পর তুই রেগে যাবি। আমি এ কথা বলেছি, ভাইয়াকে। কিন্তু আমার কথা শুনছে না ও।'

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, ভাইয়া বলেছে তোকে নিয়ে যেতে। আজ ওর জন্মদিনে ও তোকে প্রপোজ করবে।'

মিথিলার রাগটা বেড়ে গেল। ও বললো,

'রিনি, তোর কথাগুলো আমার ভালো লাগছে না। তোর কথাগুলো নোংরা লাগছে।'

'মিথিলা, প্লিজ রাগ করিস না! আমার কথা শোন।'

'এ ধরনের কথা আমি শুনতে চাই না। আমার ভালো লাগে না।'

'আমি জানি, তুই রেজাকে ভুলতে পারছিস না।'

'তুই আবারও ভুল করছিস। এটি ভুলতে পারার বিষয় নয়। একটি নিদারুন ভুল এবং এক দুঃসহ প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার এটি। এই স্থানটিতে কোন আঘাত আমি সহ্য করতে পারি না, রিনি!'

'সরি, মিথিলা। তোর ঐ একান্ড় ব্যক্তিগত অনুভূতিতে আঘাত দিতে চাইনি। আমি, আমি শুধু ভিন্ন দৃষ্টিতে আমার ভাইয়ের আবেগকে বিচার করেছি। তোর মনের অবস্থার কথা বিবেচনা করিনি।'

রিনি বিব্রতভাবে নিজের কথার ব্যাখ্যা দিল। মিথিলা কোন কথা বললো না। রিনিও কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। এক সময় মিথিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজেকে প্রস্তুত করে বললো,
'রিনি, রেজা আমার ওপর এক ধরনের প্রতিশোধ নিতে অভিমানে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ও নিজের জীবনের সকল সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়ে আমাকে কোন রকম অনুশোচনায় ভোগাতে চায়না। নিজে হেরে ও আমাকে জিতিয়ে দিতে চায়। আমাকে ঘৃণা না করে ক্ষমা করে দিয়ে ও মহৎ প্রেমিক হতে চায়। কিন্তু আমিহীন ও যে বিপন্ন, এর দায়ভার কে নেবে? আমিই বা ওর এই একা একা সব হারানোর জয়, মহত্ব বা কষ্টকে সহজভাবে ছেড়ে দেব কেন? বিত্ত, বৈভব, ভবিষ্যত বা স্বপ্ন, সংসার, সাজানো জীবন-যাই হাতের কাছে আসুক, তা মুঠোবন্দি করে আমিও কোনদিন স্বস্থি পাবো না। সুখী হবার কথা বাদই দিলাম। নিজেকে নিজে ভালো করে চিনি বলেই, চোখের সামনে আলো যতই ধাঁধিয়ে থাকুক, কখনো স্বপ্নাবিষ্ট হই না। তোর কাছে অনুরোধ, আমাকে লোভ দেখাস না। জীবন আমার কাছে এখনো ভারবাহী হয়ে ওঠেনি।'
এ কথা শুনে রিনি থ' হয়ে গেল। ও কোন কথা বলতে পারলো না। নিজের অজান্তে ওর দু'চোখের পাতা ভিজে এলো। ওর মনে হলো মিথিলার এই উপলব্ধি গভীর প্রেম এবং নির্লিপ্ত কষ্ট থেকে উৎসারিত। ও মনে মনে রেজা'র উদ্দেশ্যে বললো,
'তুমি ভীষণ ভাগ্যবান, রেজা! অনেক সাধনায় এমন প্রেম মেলে!'
রিকসা এসে থামলো বসুন্ধরা সিটি মার্কেটের সামনে। রিকসাওয়ালা বললো,
'আফা, নামেন।'
মিথিলা বললো,
'না, এখানে নামবো না। রিকসা ঘুরাও। এ্যালিফ্যান্ট রোড চলো। রিনি, তুই কি এখানে নামবি?'
'না। আমিও তোর সঙ্গে যাবো।'
জবাব দিল রিনি। রিকসাওয়ালা রিকসা ঘুরালো। মিথিলা মনে হচ্ছিলো রিনি ওর সঙ্গেই যাবে। রিনি ওকে খুব পছন্দ করে। পছন্দের মানুষকে কষ্ট দিয়ে ফেললে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না। রিনি ওর সঙ্গে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

নয়.

লিজির খুব ইচ্ছে হলো আজ ও শাড়ি পরবে। সুন্দর করে সাজবে। প্যান্ট-শার্ট বা স্কার্ট-টপস পরে পরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। গ্রামে এসেও লিজি শার্ট-প্যান্ট বা স্কার্ট-টপস পরে। এতে ও স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। শাড়ি পরার ইচ্ছে মাঝেমাঝে উঁকি দেয়, কিন্তু শাড়ি পরতে না পারার কারণে ও শাড়ি পরার চেষ্টা করে নি। কিন্তু আজ লিজির শাড়ি পরার খুব ইচ্ছে হলো। আজকের দিনটিকে ও বিশেষ করে তুলতে চায়। কিন্তু শাড়ি পরতে গিয়ে ও ভীষণ অসুবিধায় পরলো। যত চেষ্টাই করলো, ও শাড়ি পরতে পারলো না। শাড়ির আঁচল বা কুঁচি কোনটাই ও ঠিক করতে পারছিল না। শাড়ি পরা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হলো

ওর। এক সময় শাড়ির আঁচল মাটিতে ফেলে ও আয়নার সামনে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আর তখুনি আয়নায় নিজের অন্য এক রূপ দেখতে পেল ও। কোমরে এঁটে থাকা অসংলগ্ন শাড়ি, বুকে ব্লাউজ, কপালে টিপ, খোলা চুল, লাজুক দৃষ্টি-এই কম্বিন্যাশনে? অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। লিজি নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানে। কিন্তু নিজের এমন বন্য সৌন্দর্য কখনো দেখেনি ও। অর্থাৎ এভাবে নিজেকে ও কখনো দেখেনি। আয়নায় প্রতিবিম্বত নিজের এই অন্যরকম সৌন্দর্য দেখে লিজি নিজেই বেশ কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো আয়নার দিকে। এ সময় ও ভাবলো, মানুষের শারীরিক সৌন্দর্যের তীব্র আবেদন পৃথিবীতে ছিল, আছে এবং থাকবে। এই সৌন্দর্যের আকর্ষণে কামুক পুরুষ পুড়ে খাঁক হয় কামনার অশ্লীল আগুনে, কবিরা মগ্ন হয় সৃষ্টিশীলতায়, প্রেমিকরা হয় নির্ভীক-উচ্ছ্বসিত এবং নারীদের চোখ জ্বলে ওঠে রোমান্টিক ঈর্ষায়। তন্ময় হয়ে আয়নার সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল লিজি। এরপর শাড়ি পরানোর জন্য ওর মামীকে ডাকলো। ওর মামী সংসার সামলাতে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। লিজির ডাক শুনে তিনি ছুটে এলেন ওর রুমে। রুমে ঢুকে লিজিকে শাড়ি পরতে না পারার বেহাল অবস্থা দেখে হেসে ফেললেন। বললেন,

‘এতো বড় হয়েছিস, এখনো শাড়ি পরতে শিখিসনি!’

‘না মামী। আমাকে একটু হেল্প করো না!’

লিজির মামী এগিয়ে গিয়ে ওর শাড়ি ঠিক করে দিতে লাগলেন। তিনি বললেন,

‘তুই অনেক সুন্দর লিজি!’

কথাটা লিজির কানে রিনরিনিয়ে ওঠলো। ওর ভালো লাগলো। ও ভীষণ লজ্জা পেল। লিজি বললো,

‘মামী, কেন এ কথা বললে আজ? শাড়িতে কি আমাকে সুন্দর লাগে?’

‘তোকে সবকিছুতেই সুন্দর লাগে।’

‘কিন্তু আগে তো, এ কথাটি বলোনি। আজ বললে কেন?’

‘কী জানি বাবা, অতো হিসেব করে কথাটি বলিনি। তোকে আজ অন্যরকম লাগছে, তাই কথাটি বলে ফেললাম।’

লিজির মামী ওর শাড়ির কুঁচি ঠিক করে ওর কোমনে পেটিকোট গুঁজে দিতে দিতে এ কথা বললেন। লিজি বললো,

‘মামী, প্যান্ট-শার্ট পরলে কি আমাকে খারাপ লাগে?’

‘না। কে বললো খারাপ লাগে?’

‘না, কেউ বলেনি। এমনি জিজ্ঞেস করলাম। তবে গ্রামের লোকেরা মনে হয়, আমার পোশাক পছন্দ করে না।’

‘ওটা স্বাভাবিক। গ্রামের মেয়েরা তো প্যান্ট-শার্ট পড়ে না। শুধু গ্রাম নয়, শহরের মেয়েরাও শার্ট-প্যান্ট পড়ে না। তাই তারা একটু অন্যচোখে দেখে।’

লিজির মামী ওকে শাড়ি পরিয়ে দিলেন। লিজি ভীষণ খুশি হলো। ওর মামী বললো,

‘আজ শাড়ি পরলি কেন? বিশেষ কোন কারণ আছে?’

‘আছে।’
বললো ও। ওর মামী মুখ টিপে হাসলেন। তিনি বললেন,
‘কোথাও যাবি বলে মনে হচ্ছে?’
‘হ্যাঁ, মামী। আজ ঢাকা থেকে একজন ডাক্তার আসবেন। তাকে আমরা আনতে যাবো। আই মীন, আমাকে তো খুব একটা দূর যেতে হবে না। বাস স্টপিজে যাবো। ডাক্তারকে বাস স্টপিজ থেকে ভাতসাইল নিয়ে যাবো।’
‘ভাতসাইলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য অবশেষে ডাক্তার তাহলে আসছে?’
‘হুঁম্। এতোদিন পরে একজন ডাক্তার আসছেন। তাই আমরা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছি। বুঝলে না, গ্রামে কোন ডাক্তার আসতে চান না। তাই বিশেষ যত্ন নিতে হচ্ছে আমাদের।’
‘কিন্তু এই গ্রামে ডাক্তার থাকবে তো!’
‘সে চেষ্টাই তো করবো। দেখা যাক, কে আসছেন? নিশ্চয়ই গ্রামপ্রিয় কেউ হবেন। আর শোন, মামা বলেছেন, ডাক্তারের কোন রকম যেন অযত্ন-অবহেলা না হয়। আমাকেও লক্ষ্য রাখতে বলেছেন।’
‘তা বুঝলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার তো বুঝলাম না।’
‘কি?’
‘তুই আজ শাড়ি পরলি কেন? ঐ ডাক্তারের জন্য?’
এ কথায় হাসির দমকায় ভেঙে পড়লো লিজি। ওর মামী ওর হাসির সামনে কেমন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। মনে হচ্ছে, তিনি যেনও বোকার মত কোন কথা বলে ফেলেছেন। তিনি অস্বস্থি নিয়ে লিজির দিকে তাকিয়ে রইলেন। লিজি হাসির থামার পর বললো,
‘মামী, আমি ঐ ডাক্তারকে চিনি না। কে আসছেন, তা-ও জানি না।’
‘তাই নাকি! তবে এই সাজ-সজ্জা কেন?’
‘এমনিই। তুমি বুঝবে না। এখন তুমি যাও। আমি নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছি।’
লিজির মামী হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি দরজার কাছে গিয়ে বললেন,
‘তোর কাছে একটি ছেলে এসেছে। সে অপেক্ষা করছে অতিথিদের রুমে।’
মামীর এ কথায় লিজি একটু কেঁপে উঠলো। আবিদের আসার কথা। আবিদের সঙ্গে ও বাস স্টপিজে যাবে। আবিদের সঙ্গে এ কথা হয়েছে কাল। তারা দু’জনে ডাক্তারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভাতসাইল নিয়ে যাবে। আবিদ ডাক্তারকে বাস স্টপিজ থেকে ভাতসাইলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হয়নি। ওর মামা আবিদকে অনুরোধ করায় সে পরে রাজী হয়। আবিদের আসার কথা, কিন্তু ওর মামী বলছে ‘একটি ছেলের কথা’। ওর মামী আবিদকে নাম ধরে কথা বলে। সুতরাং আবিদ নয়, অন্য কেউ হবে। দ্রুত কথাগুলো ভেবে লিজি ওর মামীর দিকে অবাক চোখ তুলে বললো,
‘আমার কাছে এসেছে? কে?’

‘হ্যাঁ, তোর কাছেই এসেছে। ভাতসাইলের ছেলে। নাম বললো রাহাত। তুই নাকি চিনিস ওকে?’
প্রশ্নের জবাব না নিয়েই ওর মামী বের হয়ে গেলেন রুম থেকে। লিজি ভীষণ অবাক হলো। রাহাত কেন এসেছে, ও বুঝতে পারলো না। ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। এরপর ও শাড়ি খুলে ফেললো। শাড়ি-ব্লাউজ খুলে ও প্যান্ট-শার্ট পড়লো। শাড়ি পরে ও রাহাতের সামনে যেতে চায়না। ও রুম থেকে বেরিয়ে চলে গেল অতিথিদের রুমে। বিশাল ড্রয়ং রুম এটি। ওর মামার কাছে প্রতিদিন অনেক লোক আসেন। এই রুমেই সবাই বসেন। লিজি রুমে ঢুকতেই সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো রাহাত। রুমে আর কেউ নেই। লিজি রাহাতের দিকে তাকিয়ে বললো,
‘আপনি নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?’
‘জ্বি।’
‘কেন বলুন তো?’
লিজির এ প্রশ্ন বিব্রত হয়ে গেল রাহাত। ও বললো,
‘আপনাকে বলেছিলাম ---।’
‘আমি নাটক করতে পারবো না, আগেই তো বলেছি।’
লিজির এ কথায় একটু ভড়কে গেলেও রাহাত বললো,
‘সবাই প্রথমে এ রকম বলে। পরে যখন স্টার হয়ে যায়, তখন তারা প্রথমদিনের কথা মনে করতে চান না।’
‘ঠিক বুঝলাম না, আপনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন?’
‘বলতে চাচ্ছি, আমাদের প্রডাক্টশন হাউজ এই গ্রামে এসে একটা টেলিফিল্ম বানাতে রাজী হয়েছে। গল্প এখনো ঠিক হয়নি। তবে গল্পের নায়িকা হিসাবে আপনাকে ঠিক করেছি। এখন আপনি রাজী থাকলে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে শুটিং শুরু করতে পারি। আপনার বিপরীতে নায়ক থাকবেন মাহফুজ। এখন ওর ভীষণ ক্রেজ, বুঝলেন!’
রাহাতের কথায় একটু হাসলো লিজি। ও বেশী কথা বাড়াতে চায় না। যে কোন সময় আবিদ চলে আসবে। ওকে যেতে হবে বাস স্টপিজে। ও রাহাতের উদ্দেশে বললো,
‘রাহাত সাহেব, আপনি কি সত্যিসত্যি নাটকের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন? নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে?’
এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না রাহাত। ও হচকিয়ে গেল। ও কিছু বলতে পারলো না। ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। লিজি বললো,
‘আমি জানি, নাটকের প্রস্ড়বটা একটা অজুহাত। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমার কাজিনরা এ কথা জানলে তারা আপনার কী করবেন?’
‘জ্বি, জানি।’
‘তারা কিন্তু একবার একজনকে...!’
‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা তো জানি!’

‘তাহলে?’

‘তাহলে কি আমি চলে যাবো?’

‘দ্যাটস রাইট!’

‘ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে আপনি যদি নাটক করতে চান, জানাবেন।’

‘আপনাকে আগেও বলেছি। এখনো বলছি, নাটক আমাকে দিয়ে হবে না। আমার মধ্যে সে গুণ নেই।’

‘কিন্তু আমি জানি, আপনি এ লাইনে এলে খুব নাম করতে পারবেন। আপনি কিন্তু ভীষণ ফটোজেনিক!’

‘তাই নাকি! আপনি কি আমার ছবি কখনো দেখেছেন?’

বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন করলো লিজি। রাহাত দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললো,

‘আমার চোখই ক্যামেরা! আপনাকে দেখেই মনে হয়েছে, ক্যামেরায় আপনাকে অস্পরীর মতো লাগবে। আপনার স্মার্টনেসটার আলাদা মাত্রা আছে। আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবেন না!’

রাহাতের কথা শুনতে শুনতে লিজি হাসছিল। ও বললো,

‘রাহাত সাহেব, আপনার ঐ চোখের ক্যামেরাটা এবার আমার দিক থেকে সরিয়ে নিন, প্লিজ! আমি আপনার ফ্লাটারিংয়ে একটুও গলবো না। আমাকে দিয়ে অভিনয়-টভিনয় হবে না- তা আমি নিজেই জানি। তাই, সে চেষ্টা আর করবেন না, প্লিজ!’

‘আপনি আরও কয়েকদিন ভেবে দেখবেন কি?’

এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে লিজি বললো,

‘আপনি কি যাবেন? আমাকে একটু বের হতে হবে।’

রাহাত ভেবেছিল লিজির কাছে ও প্রশ্রয় পাবে। কিন্তু ও বুঝতে পারছে, তা হবে না। লিজি বাইরে থেকে নরম মনের মানুষ হলেও ভেতরে ভীষণ কঠিন। রাহাত হতাশ হয়ে দরজার সামনে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে লিজির উদ্দেশে বললো,
'যাবার সময় আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'
'বলুন।'
'যে ছেলেটি আপনাকে ফলো করে কঠিন শাস্তি পেয়েছিল, সে ছেলেটি হচ্ছি আমি।'
'আমি জানি।'
'জানেন! মানে জানতেন!'
'হুঁম্। এরজন্য আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু আপনি যা চাইছেন, সেটা সহানুভূতি নয়।'
এ কথার জবাবে কী বলা যায়, রাহাত সেটা ঠিক করতে পারলো না। ও বিষণ্ন হয়ে গেল। বিষণ্নতার রেশ নিয়ে ও দ্রুত বেড়িয়ে গেলো লিজিদের অতিথি রুম থেকে। লিজির মনটাও একটু বিষণ্ন হয়ে গেল। অকারণে বিষণ্নতা। লিজি মনে মনে এই মুহূর্তের নাম দিল 'বিষণ্ন বিলাস!'

দশ.

আবিদ এলো ভরদুপুর মাথায় করে। লিজি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলো। অপেক্ষায় ছটফট করছিলো ও। দেরী করে এসেও আবিদ ওকে 'সরি' বললো না। এটা ভীষণ অভদ্রতা। আমেরিকায় কেউ দেরী করে এসে 'সরি' বলবো না এ রকম ভাবাই যায় না। বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে কি বিনয়ের অভাব? নাকি এ ধরনের জীবনাচরণে তারা অভ্যস্থ ? এই প্রশ্ন লিজির মনে উঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেল। আবিদ ইচ্ছে করেই লিজিকে 'সরি' বলেনি বা দেরী কেন হলো এর কৈফিয়ত দেয়নি-এটা বুঝতে পারছে লিজি। আবিদের মধ্যে এক ধরনের দাম্ভিকতা আছে, সেটা ও জানে। লিজি আবিদের সঙ্গে ওদের বাড়ি থেকে বেড় হয়ে এবার অবাক হলো। ওদের বাড়ির সামনে গরুর গাড়ি থেমে আছে। ওর মামা বলেছিল ডাক্তারকে রিসিভ করতে প্রাইভেট কার বা মাইক্রোবাস নিয়ে যেতে। কিন্তু আবিদ নিয়ে এসেছে গরুর গাড়ি। 'লোকটি সত্যিসত্যিই পাগল!' মনে মনে ভাবলো ও। লিজি আবিদের দিকে তাকিয়ে বললো,
'আপনি কি পাগল?'
'কেন এ কথা বললেন?'
জানতে চাইলো আবিদ। লিজি বললো,
'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কেন গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছেন? এখন কী কেউ আর গরুর গাড়িতে চড়ে? আর ডাক্তার কী ভাববেন?'
এ কথায় একটু হাসলো আবিদ। ও জানতো লিজি অবাক হবে, তবে বিরক্ত হবে এটা ভাবেনি। আবিদ বললো,

'আপনি নিশ্চয় জানেন, এই অঞ্চলটায় এক সময় গরুর গাড়ি খুব চলতো। এখন ও সব নেই বললেই চলে। আমার মনে হলো, শহর থেকে আসা ডাক্তারকে একটু ব্যতিক্রমভাবে অভ্যর্থনা জানাই। শহরের কেউ গরুর গাড়িতে চড়েছে কিনা-কে জানে। তাই ভাবলাম, নতুন ডাক্তারকে গরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে আসি। আপনি আপত্তি করলে, না হয় একটা বেবীটেক্সি বা কার নিয়ে আসি।'

আবিদের কথা কেন জানি ভালো লাগলো লিজির। ওর রাগটা নেমে এলো। বললো,

'না, না, তার আর দরকার নেই। আমি নিজেও গরুর গাড়িতে কখনো চড়িনি।'

'তাহলে তো আপনারও নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

এ কথা বলে আবিদ হাসার চেষ্টা করলো। আজ আবিদকে কেমন অন্য রকম লাগছে। গম্ভীরতা নেই। কথা বলছে। আবার কথা বলার সময় লিজির চোখে একবার চোখ রেখেছে। খানিক ক্ষণের দৃষ্টি বিনিময়, কিন্তু লিজির ভেতরটা যেনও কেঁপে গেছে। কেন এমন হলো? মনে মনে ভাবে লিজি। আবিদ বললো,

'এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন, নাকি গরুর গাড়িতে উঠবেন?'

লিজি 'ও আচ্ছা!' বলে তাড়াতাড়ি গরুর গাড়িতে উঠে পড়লো। আবিদ গরুর গাড়ির সামনে এসে বললো,

'আপনি অনুমতি দিলে আমি গাড়িতে উঠে আপনার পাশে বসতে পারি।'

এ কথায় একটু অবাক হলো লিজি। ও বললো,

'আপনার মধ্যে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখে অবাক না হয়ে পারছি না।'

'তাই নাকি! তাহলে আমাকে অভদ্রলোক মনে করেন আপনি?'

'আপনি কি নিজেকে ভদ্রলোক দাবি করেন?'

লিজির এই প্রশ্নে আবিদ চুপসে গেল। ও কোন জবাব না দিয়ে গরুর গাড়িতে উঠে পড়লো। ও যতটুকু সম্ভব লিজির কাছ থেকে দূরত্ব রেখে বসলো। এরপর গরুর গাড়ির চালককে বললো,

'ডালিম মিয়া, গাড়ি চালাও।'

গাড়িয়াল ডালিম মিয়া গরুর লাগাম টান দিয়ে লম্বা লাঠি দিয়ে গরুর পিঠে আঘাত করলো। গরু দু'টি চলতে শুরু করলো। একটা ঝাঁকুনি লাগলো। গরুর গাড়ির চাকার 'ক্যাচ ক্যাচ' শব্দ হতে লাগলো। আবিদ এই প্রথম লিজির পাশে বসেছে। ও লিজির দিকে তাকাচ্ছে না। ও তাকিয়ে রইলো দূর দিগন্তের দিকে। লিজি আবিদের উদ্দেশে বললো,

'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পাইনি।'

আবিদ দিগন্তের দিকে মুখ রেখে বললো,

'শুধু ভদ্রলোকের দাবি নয়, আমার কোন কিছুই নেই, যা নিজের পক্ষে দাবি করতে পারি।'

'ওটা আপনার মুখোশ। নিজেকে আড়াল করে আপনি আসলে কী গোপন করতে চান, বলুন তো?'

কণ্ঠে জোর দিয়ে বললো লিজি। একটু চুপ থেকে আবিদ বললো,

‘আমার গোপনীয়তা নিয়ে আপনার এতো কৌতুহল কেন, জানি না।’
‘তাহলে গোপনীয়তা আছে? কী সেই গোপনীয়তা? বলতে অসুবিধা আছে?’
প্রশ্নটা করে নিজেই বিব্রত হলো লিজি। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার জানার ইচ্ছা প্রকাশ করাটাও ভদ্রটার মধ্যে পড়ে না। একটু আগে ও আবিদকে অভদ্র বলেছে, এখন নিজের ভদ্রতাজ্ঞান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেল। আবিদ লিজির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললো,
‘আজ আপনাকে অন্যরকম লাগছে।’
এ কথায় ভীষণ অবাক হলো লিজি। এ ধরনের কথা আবিদ কখনো ওকে বলেনি। অথচ এখন এ কথাটি বললো অপ্রাসঙ্গিকভাবে। লিজি অবাক চোখ তুলে বললো,
‘আমাকে কেমন লাগছে? খুব সুন্দর, নাকি ভূতের মতো? আই মীন এঞ্জেল অর গোস্ট?’
এ কথায় আবিদ একটু হাসলো। বললো,
‘আজ আপনি শার্ট-প্যান্ট পরে কপালে টিপ পড়েছেন। তাই আপনাকে অন্যরকম লাগছে।’
লিজি চট করে কপালে হাত দিয়ে দেখলো সত্যিই সেখানে টিপ আছে। শাড়ি পরার সময় ও টিপ লাগিয়েছিল। শাড়ি খোলার সময় তাড়াহুড়ার কারণে টিপ খুলতে ভুলে গেছে। ও একটু লজ্জায় পড়ে গেল। ওকে আজ শাড়ি পরা দেখলে আবিদ কী বলতো-কে জানে। লিজি সঙ্কোচ জড়ানো কণ্ঠে বললো,
‘আমি ভেবেছিলাম, আপনি কারো দিকে তাকান না!’
এ কথায় আবিদ ফের হাসলো। এর কোন জবাব দিল না। লিজি বললো,
‘আজ একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?’
‘না, আমি কোন প্রশ্নের জবাব দিই না।’
‘শুধু একটা প্রশ্ন করবো। অন্যরকম একটা প্রশ্ন। প্রশ্নটি আগে শুনুন। ইচ্ছে হলে উত্তর দেবেন। না হলে দেবেন না। প্লিজ!’
আবিদ কোন কথা বললো না। লিজি নাছোরবান্দা। ও বললো,
‘আজ আপনার পরিচয়ের কথা জানতে চাইবো না।’
‘এ ছাড়া তো আপনার কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না।’
বললো আবিদ। লিজি বললো,
‘সত্যি বলছি, অন্যরকম প্রশ্ন।’
‘ঠিক আছে, বলুন।’
‘আমার প্রশ্ন হলো, আপনি কি কখনো কাউকে ভালোবেসেছেন?’
প্রশ্নটা তুমুল নাড়িয়ে দিল আবিদকে। যেনও ওর বোধে বজ্রপাত হলো। ও হতভম্ব হয়ে গেল। প্রশ্নটার কোন জবাব ও দিতে পারলো না। আবিদ দিগন্তের দিকে বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো। বাকিটা পথ ও কোন কথাই বললো না। লিজি জানে, এ ধরনের প্রশ্নের জবাব আবিদ দেবে না। কিন্তু প্রশ্নটা তাকে কেমন কাঁপিয়ে দিয়েছে। লিজির মনে হলো, এই প্রশ্নের জবাব পেলে আবিদের আড়াল করে রাখা অতীতে খানিকটা আলো ফেলা যেতো। কিন্তু আবিদ এই প্রশ্নে একেবারে চুপসে গেছে। ও আর কোন প্রশ্ন করলো না।

লিজি এক সময় বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। ইট বিছানো ভাঙ্গাচোড়া রাস্তার ওপর দিয়ে গরুর গাড়ি চলছে। গাড়িটা যেতে যেতে দুলছে। গরুর গাড়ির মহিলা আরোহী প্যান্ট-শার্ট পরিহিত। দৃশ্যটা অন্যরকম হলেও লিজিকে এই এলাকার সকলে চেনে। তাই পথচারীরা এ ব্যাপারে কৌতূহল দেখাচ্ছে না। বাস স্টপিজের কাছাকাছি একটি চায়ের স্টলের সামনে গরুর গাড়ি আসতে আবিদ ডালিম মিয়ার উদ্দেশে বললো,

'ডালিম মিয়া, এখানে গাড়ি থামাও।'

'জে, আচ্ছা।'

ডালিম মিয়া গরুর লাগাম টেনে ধরলো। 'থাম' 'থাম' বলে জোরে শব্দও করলো সে। গরু দুটি থেমে যেন স্বস্থি পেল। গুমোট গরমের দুপুর। বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকায় গরমটা তেতে আছে। আবিদ গাড়ি থেকে নামলো। ওকে দেখে চায়ের স্টলের মালিক রহিম মিয়া দাঁত কেলিয়ে হাসলো। বললো,

'স্যার, আ্যাসেন। ভালো কইরা চা বানাইয়া দেই।'

আবিদ লিজির দিকে তাকিয়ে বললো,

'আপনি কি চা খাবেন?'

লিজি এর কোন জবাব না দিয়ে গরুর গাড়ি থেকে নামলো। এরপর বললো,

'বাস স্টপিজের সামনে থামলে ভালো হতো না? এতো আগে কেন গাড়িটা থামালেন?'

লিজি এ প্রশ্ন করবে আবিদ জানতো। ও বললো,

'বাস স্টপিজের খানিকটা আগে গাড়িটা থামানোর কারণ হচ্ছে, গরুর গাড়ি নিয়ে বাস স্টপিজে গেলে সেখানে মানুষের ছোট খাটো একটা ভিড় লেগে যাবে। আমরা গরুর গাড়ি কেন নিয়ে এসেছি, এই প্রশ্নের জবাব অনেককে দিতে হবে। কৌতুহলী মানুষের অহেতুক জটলা হবে।'

আবিদের কথার জবাবে লিজি প্রশ্ন করলো,

'আপনি মানুষের কৌতুহলকে এতো ভয় পান কেন?'

এর জবাবে আবিদ লিজির দিকে তাকালো। ও লিজির চোখে চোখ রেখে বললো,

'নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাই বলে।'

কথাটি বলে আবিদের মনে হলো, লিজিকে এ কথা বলা ঠিক হয়নি। লিজি এখন এই প্রশ্নের জবাব খুঁজবে। মানুষ চাইলেও সবসময় নিজের ভেতরের কথাকে চেপে রাখতে পারে না। কখনো কখনো হঠাৎ নক্ষত্রের পতনের মতো যত্ন করে চেপে রাখা কথা বেরিয়ে আসে। এখনো তাই হলো। লিজি প্রশ্ন করলো,

'কেনও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছেন? আপনার জীবন নিয়ে আপনি কি খুব হতাশ?'

আবিদ কিছু বললো না। ও চায়ের স্টলের মালিক রহিম মিয়াকে বললো,

'রহিম মিয়া, ভালো করে দু'কাপ চা বানাও।'

রহিম মিয়া খুশি হলো। আবিদ স্যার কখনো তার দোকানে আসেননি। আজ এসে চা চাইছেন। রহিম মিয়া তাদের দেখে চা বানাচ্ছিলো। সে বললো,

'স্যার, একটু অপেক্ষা করেন। গরম পানি দিয়া কাপ ধুইয়া দিতাছি!'
লিজি রহিম মিয়ার উদ্দেশে বললো,
'আপনি এখুনিই চা বানাবেন না। আমরা এখুনি চা পান করবো না।'
'কেনো?'
রহিম মিয়া হতাশ গলায় জানতে চাইলো। লিজি বললো,
'আমরা একজনকে বাস স্টপিজ থেকে রিসিভ করতে এসেছি। আগে তাকে নিয়ে আসি, তারপর চা পান করবো। হয়তো ডাক্তার এসে গেছেন।'
কথাটি বলে সে আবিদের দিকে তাকালো। ও আবিদের উদ্দেশে বললো,
'চলুন, আগে বাস স্টপিজে যাই। যদি ডাক্তার চলে এসে থাকেন!'
লিজির এই উদ্বেগে চিন্তিত হলো আবিদ। ও বললো,
'ডাক্তার কখন আসবেন, কে আসবেন, তা জানেন?'
'আপনি জানেন না?'
প্রশ্নটি করলেও লিজি জানে, এ সব আবিদ জানে না। ওর মামা ওকে ডাক্তারের নাম বলে দিয়েছেন। ডাক্তারের আসার সময়ও বলেছেন। সে সময় অনুযায়ী ডাক্তার আর কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন। লিজির প্রশ্নের জবাবে আবিদ বললো,
'না। আমি জানবো কেনও?'
'না জেনে, চলে এসেছেন ডাক্তারকে রিসিভ করতে?'
'আপনি আছেন না! তা ছাড়া শহর থেকে আসা লোক দেখলেই চেনা যাবে। চলুন, আমরা পায়ে হেঁটেই বাস স্টপিজের দিকে যাই। আমাদের গাড়ি এখানেই থাক। অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমরা এখানে চা খাবো। তারপর যাবো। কেমন?'
বললো আবিদ। লিজি বললো,
'নো-প্রবলেম।'
ও আজ একটু অবাক হচ্ছে। আবিদকে ও কখনো চা পান করতে দেখেনি। আবিদ হয়তো চা পান করে, ও তা দেখেনি। এতে অবাক হবার কিছু নেই। মনে মনে নিজেকেই বললো ও। আবিদ ও লিজি এগিয়ে গেল চাকসাইলের বাস স্টপিজের দিকে। চার রাস্তার মোড়ে এই বাস স্টপিজ। এই মোড়টি একটু ব্যস্ত। বড় রাস্তার চলমান বাস এই মোড়ে কিছুক্ষণের জন্য থামে। তখন এই বাস স্টপিজকে কিছুক্ষণের জন্য চঞ্চল করে দেয়। এরপর বাসগুলো চলে যায় দূরে, বহুদূরে, নিজ নিজ গন্তব্যে। চাকসাইলের এই বাস স্টপিজে এসে দাঁড়ালে আবিদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। আজও মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠলো। ওর ভেতরে কেমন একটা ঢেউ ছড়িয়ে গেল। সে এক অন্যরকম ঢেউ।

এগার.

মিথিলা কখনো এমন ধরনের বাসে চড়েনি। বাসের ভেতরে মানুষে ঠাসাঠাসি। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসার সময় বাসটিতে যাত্রীদের সংখ্যা বেশি ছিল না। বাসটি বগুড়ায় আসার পর

বিভিন্ন স্থানে থামতে লাগলো। উঠা নামা করতে লাগলো যাত্রী। কিছুক্ষণ পরপরই বাস থামে, আবার চলতে শুরু করে। বাসের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের চিৎকার-চেঁচামেচি ওর ভালো লাগছিল না। এই ভালো না লাগার ব্যাপারটি ও নিজের মনে প্রশ্রয় দেয়নি। মিথিলা আজ নিজের মনকে প্রস্তুত করে এসেছে। বগুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গিঞ্জি গ্রাম ভাতসাইলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার হিসাবে ও চাকরি নিয়ে এসেছে। গ্রামের সাধারণ ও দরিদ্র লোকদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হবে ওকে।

তাই বাসে বসে থেকে ও বিরক্ত হলেও তা মেনে নিয়েছে। এক সময় ওর বাস এসে থামলো চাকসাইলে। বাসের হেলপার চেঁচিয়ে ওঠলো 'চাকসাইল, চাকসাইল!' বলে। বেশ কয়েকজন যাত্রী হুড়মুড় করে নামলো। মিথিলা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে বাসের গেটের কাছে এলো। ওর হাতে একটি স্যুটকেস। বাসের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল ও। ওকে কেউ নিতে আসার কথা। বাস থেকে নেমে যাওয়া মানুষের জটলায় ও ভালো করে চারপাশে কে আছে, তা দেখতে পারলো না। ও একটু অবাক হলো। এই নিরেট গ্রামে ওর জন্য কি কেউ আসেনি? প্রশ্নটা মনে উঁকি দিতেই ও দেখতো পেল প্যান্ট-শার্ট পরিহিত একটি স্মার্ট মেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মিথিলার অজানা ভয়টা মিইয়ে যেতে লাগলো। মেয়েটি মিষ্টি হাসি মুখে ধরে রেখে ওর দিকে এগিয়ে এলো। মিথিলার মন হেসে উঠলো। ও স্যুটকেস হাতে নিয়ে বাস থেকে নেমে দাঁড়ালো। চাকসাইলের এই বাস স্টপিজের কোলাহল ধীরে ধীরে কমে আসছে। মেয়েটি খুব দ্রুত মিথিলার দিকে এগিয়ে এলো। মেয়েটি ওর সামনে আসতেই ও মিষ্টি করে হাসল। এই হাসির মধ্য দিয়েই ও যেন মেয়েটিকে বলে দিল, 'আমি মিথিলা, ডাক্তার হিসাবে তোমাদের গ্রামে এসেছি।' মেয়েটি ওর হাসির জবাবে বললো,

'হাই, আমি লিজি। আপনি নিশ্চয়, ভাতসাইলের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার হিসাবে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার নাম মিথিলা।'

'বাহ্! খুব সুন্দর নাম তো আপনার!'

'আপনার নামও খুউব সুন্দর এবং আপনিও!'

'থ্যাংকস ফর দ্যা কমেন্টস। বাই দ্যা ওয়ে, আপনার কি একটিমাত্র লাগেজ?'

'হ্যাঁ। আপাতত একটিই। প্রয়োজন হলে আরো আনা যাবে।'

এ কথা বলে হাসলো মিথিলা। লিজি বললো,

'আপনি কিন্তু খুউব সুন্দর এবং আপনার হাসিটাও!'

'আপনাকেও ধন্যবাদ। তা আমরা যাবো কিভাবে?'

মিথিলার এই প্রশ্নে লিজির মনে হলো আবিদের কথা। আবিদ ওর পাশে নেই। কিছুক্ষণ আগেও ছিল। কোথায় গেল সে? প্রশ্নটি মনে করে ও চারপাশে তাকালো। কোথাও আবিদকে দেখতে পেল না লিজি। আশ্চর্য! লোকটির মাথায় গোলমাল নিশ্চয় আছে, ভাবলো ও। লিজির বিব্রতবোধ দেখে মিথিলা বললো,

‘কোন সমস্যা হয়েছে? আই মীন, আপনি কি কিছু খুঁজছেন?’
‘না কিছু হারায়নি। তবে একজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি না। তিনি আমার সঙ্গেই ছিলেন।’
লিজির এ কথার জবাবে মিথিলা বললো,
‘ও, আচ্ছা!’
লিজি আবারো চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। কোথাও আবিদকে দেখা যাচ্ছে না। লিজির এই মুহূর্তে আবিদের উপর ভীষণ রাগ হলো। এমন কান্ডজ্ঞানহীন মানুষ ও কখনো দেখেনি। ডাক্তার বাস থেকে নেমে বড় একটি স্যুটকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ আবিদ কাছে নেই। এই স্যুটকেস কে টেনে নিয়ে যাবে গরুর গাড়ি পর্যন্ত? এ কথা ভেবে লিজি মিথিলাকে বললো,
‘আপনি কি আমাকে আপনার স্যুটকেসটি দেবেন? আমাদের গাড়ি একটু দূরে। খানিকটা হেঁটে যেতে হবে।’
‘ঠিক আছে, চলুন। আমি লাগেজ টেনে নিয়ে যেতে পারবো।’
‘না, না, তা কী করে হয়? দাঁড়ান, আমি দেখছি, কী করা যায়।’
এ কথা বলে বাস স্টপিজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিক শ্রেণীর একজন লোককে হাতের ইশারায় ডাকলো ও। লোকটি ওর হাতের ইশারা দেখতে পেয়ে চলে এলো। লিজি জানে, ওকে এই গ্রামের প্রায় সকলে চেনে। যে কেউ ওর ডাকে এগিয়ে আসবে। লোকটি কাছে আসতে লিজি বললো,
‘আপনার নাম কি?’
‘জয়নাল।’
জয়নাল নিজের নাম বলতে পেরে খুব আনন্দিত হলো। গ্রামের লোকদের এ ধরনের সরলতা লিজির খুব ভালো লাগে। ও জয়নালের উদ্দেশে নরম গলায় বললো,
‘আপনি কি তার হাতের ব্যাগটা রহিম মিয়ার চায়ের স্টলের সামনে নিয়ে দিতে পারবেন? এরজন্য আপনাকে ৫০ টাকা দেব।’
‘৫০ টাকা!’
‘হ্যাঁ, ৫০ টাকা। ব্যাগটা তার হাত থেকে তুলে নিন।’
লিজির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জয়নাল মিথিলার হাত থেকে তুলে নিল ব্যাগটি। সে কোন কথা না বলেই হাঁটতে লাগলো রহিম মিয়ার চায়ের স্টলের দিকে। মিথিলা লিজির ব্যবহারে মুগ্ধ হলো। সবচেয়ে বেশি অবাক হলো, এমন নিরেট গ্রামে প্যান্ট-শার্ট পড়া লিজিকে দেখে। গ্রামে মেয়েরা এমন স্মার্ট হয়েছে, ওর জানা ছিল না। ও লিজির উদ্দেশে বললো,
‘এমন গ্রামে আপনার মতো মেয়ে দেখতে পাবো, ভাবতেই পারিনি।’
‘আমি আবার কী এমন মেয়ে!’
‘আপনি অনেক স্মার্ট!’
এ কথায় মুচকি হাসলো লিজি। বললো,

‘সত্যি কথা বলতে কী, আপনাকে দেখে আমিও অবাক হয়েছি। এমন নিভৃত গ্রামে আপনি কেন এলেন, বুঝতে পারছি না।’
‘নিভৃত গ্রাম বলে কেউ আসবে না, তাতো ঠিক নয়।’
বললো মিথিলা। মনে মনে ও বললো, ‘হয়তো আমাকে আরো অনেক গ্রামে যেতে হবে!’ লিজি প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মেলে বললো,
‘একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো?’
‘করুন।’
‘আপনি একা এলেন কেন? আপনার স্বামী বা..!’
‘আমার এমন কেউ নেই।’
‘মানে!’
‘মানে, আমি এখনো বিয়ে করিনি।’
‘তাহলে তো আরো বিস্মিত হতে হয়!’
‘কেন?’
‘অবিবাহিত মেয়ে ডাক্তার হয়ে একা এই গ্রামে এসেছেন বলে!’
‘মেয়েরা বুঝি সব সময় পিছিয়ে থাকবে? আপনাকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না!’
এ কথায় হাসলো লিজি। মিথিলার স্মার্টনেস ওর ভালো লাগলো। ও বললো,
‘ঠিক আছে, চলুন। আমরা এগিয়ে যাই।’
‘আচ্ছা, চলুন।’
ওরা দুজনে রহিম মিয়ার চায়ের স্টলের দিকে এগিয়ে গেল।

রহিম মিয়ার চায়ের স্টলে এসে দেখলো জয়নাল দাঁড়িয়ে আছে মিথিলার ব্যাগ নিয়ে। লিজি ওর প্যান্টের পকেট থেকে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে দিল জয়নালের দিকে। জয়নাল টাকাটা নিয়ে হাসিমুখে চলে গেল। রহিম মিয়া ওদের দেখে বিগলিত। চায়ের স্টলের সামনে স্থাপিত কাঠের লম্বা টুল ওদের দেখিয়ে রহিম মিয়া বললো,
‘আফা, আপনেরা একটু বসেন। ভালো কইরা চা বানাইয়া দেই। গরম চা। চুমুক দিলেই পরানটা ঠান্ডা হইয়া যাইবো। বসেন, টুলটায় বসেন।’
গরম চা পান করে প্রাণ ঠান্ডা হয় কিনা, জানে না লিজি। তবে রহিম মিয়ার আন্তরিকতা ওর ভালো লাগছে। ও চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে কোথাও আবিদকে দেখতে পেল না। ও রহিম মিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো,
‘তুমি কি আবিদ স্যারকে দেখেছো?’
লিজির প্রশ্নে দাঁত কেলিয়ে হাসলো রহিম মিয়া। সে বললো,
‘তিনি তো ঝড়ের মতো আইলেন, আর গেলেন।’
‘তাই নাকি! কোনদিকে গেলেন?’

'ঐ বাস স্টপিজের দিকেই হয়তো গেলেন। আপনে ডালিম মিয়ারে জিগান। তিনি ওর লগে কী যেন কথা বইল্যা গেছে!'

এ সময় মিথিলা লিজির কাছে প্রশ্ন করলো,

'আপনার সঙ্গে কি আর কেউ আছেন? আই মীন, কাউকে খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে আরো একজন যাবেন। তাকে কোথাও দেখছি না। দাঁড়ান, দেখছি তিনি কোথায় গেছেন। আপনি এখানে বসুন এবং রহিম মিয়ার স্পেশাল চা পান করুন। আমি আসছি।'

এ কথা বলে লিজি এগিয়ে গেল গরুর গাড়ির দিখে। মিথিলা বসলো রহিম মিয়ার দোকানের সামনে টুলের উপর। ও বেশ ক্লান্ড়। এক কাপ চা হলে মন্দ হবে না, ভাবলো ও। লিজি ডালিম মিয়ার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'আবিদ স্যার কোথায় গেছে বলতে পারো? তাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

গাড়িয়াল ডালিম মিয়া লিজির দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললো,

'স্যার এটা আপনারে দিতে বলে ঐ দিকে চলে গেছেন।'

ছোঁ মেরে কাগজটা নিল লিজি। কাগজটি চোখের সামনে মেলে ধরতেই ও বুঝতে পারলো এটি আবিদের একটি চিঠি। আবিদ লিখেছে,

লিজি,

আমার এই পত্র যখন পাবেন, ততক্ষণে আমি হয়তো অনেক দূর চলে যাবো। অপ্রত্যাশিত হলেও আপনাকে এই পত্রটি লিখতে হলো। আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন আমার পরিচয় জানতে। আমি চেষ্টা করেছি, নিজেকে গোপন করে রাখতে। আমি কখনো ভাবিনি আপনাকে আমার নিজের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলবো। কিন্তু আজ বলতে হচ্ছে। আমার নাম আবিদ রেজা। পরিচিতজন আমাকে রেজা নামে ডাকতো। আমি অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনে গম গবেষণা প্রজেক্টে ডাটা এনালিস্ট পদে চাকরি করতাম।

আপনি জানতে চেয়েছিলেন, আমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলাম কিনা। এর জবাবে এখন বলছি, হ্যাঁ, আমি একজনকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসতাম। তাকে এতোটাই ভালোবাসতাম যে, আমার প্রতিটি স্পন্দনে তার নাম উচ্চারিত হতো। এখনো হয়। একদিন ঐ মেয়েটি তার অসুস্থ বাবার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে হুট করে বিয়ে করে ফেলে। বিয়ের আগে আমি তাদের বাড়ি পৌঁছেছিলাম। কিন্তু সে আমাকে ফিরিয়ে দেয়। আমার আকুতি নিষ্ফল হাহাকার হয়ে যায়। সেদিন থেকে নিজের ভালোবাসার প্রতি অগাদ বিশ্বাসটুকু আমার কণ্ঠনালীতে বিষ হয়ে আটকে আছে। এই বিষ আমাকে প্রতিনিয়ত হত্যা করে। আমি যেনও জীবন-মৃত্যু এক মানুষ। জীবনের প্রতি আমার আর কোন আকর্ষণ নেই। তাই একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে নেমে পড়লাম পথে। চেনা জগত বা সংসার থেকে বিনা নোটিশে নিরুদ্দেশ হলাম। পরিচয়হীন জীবন আর অচেনা পথ আমার অবলম্বন। চলতে চলতে ভাতসাইলে এসে থেমে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ অনেকগুলো দিন পর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারকে আনতে

গিয়ে আমার পুরো অস্তিত্ব কেঁপে উঠলো। হৃদয়টা আরেকবার ভেঙে চূড় হলো। যে ডাক্তার ভাতসাইলে এসেছেন, তাকেই নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে আজ আমি সর্বশান্ত। চাকসাইলের বাস স্টপিজে মিথিলা যখন বাস থেকে নামছিলো, ওকে দূর থেকে দেখার পর মনে হলো- এখুনি পালাতে হবে। জীবন থেকে পালাতে না পারলেও সমাজ থেকে বা চেনা মুখের গন্ডি থেকে পালানো ছাড়া আমার আর কোন পথ জানা নেই। তাই আবারো নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ হলো-দেখবেন, মিথিলার যেনও কোন সমস্যা না হয়। ওকে বিশেষভাবে সাহায্য করার বিনীত অনুরোধ রাখছি। বলতে দ্বিধা নেই, মিথিলাকে ঘৃণা করতে পারিনি বলেই ভালোবাসার দায় এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি। শেষ অনুরোধ-আমি যে এই গ্রামে ছিলাম এবং নিঃশব্দে চলে গেলাম, এ কথা ওকে কখনো বলবেন না, প্লিজ!

আপনার সুন্দর জীবন কামনা করছি।

আবিদ রেজা।

চিঠিটা পড়ে লিজি স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রবল বিস্ময় আর সূক্ষ্ম বেদনার সম্মিলিত স্রোত ওর ভেতরে বয়ে যেতে লাগলো। এমন কি হয়? ভালোবাসা মানুষকে এতোটা ইমোশনাল করে দেয়? ভালোবাসায় ব্যর্থ হলে কেউ এমন জীবন বিমুখ হয়? নিজের সব সম্ভাবনাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে অনিশ্চিত ও অর্থহীন ভবিষ্যতের দিকে চলে যায়? স্বপ্নবিহীন পথ চলা কি নিজের কাছে নিজের এক ধরনের কমিটমেন্ট নাকি অভিনব কোন অভিমান? নাকি এটাই ভালোবাসার মহত্ব? ভালোবাসা কি কোন পাগলামী? না হলে জীবন নিয়ে এমন পাগলামী কেউ করে? প্রশ্নগুলো লিজির মনে পুকুরের পানিতে বুদবুদ ওঠার মতো একটার পর একটা উঠতে লাগলো। এই পশ্নগুলোর জবাব ওর জানা নেই। লিজির মনে আরেকটি প্রশ্ন কাঁটার মতো বিঁধলো। সেটি হলো, আবিদ রেজা লিখেছে, মিথিলার বিয়ে হয়ে গেছে বলেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে। অথচ মিথিলা কিছুক্ষণ আগেই ওকে জানিয়েছে, সে অবিবাহিত। তারমানে কোথাও একটা ভুল রয়ে গেছে। আবিদ কি তাহলে ভুল বুঝে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? প্রশ্নটা ওকে ভীষণ কাঁপিয়ে দিল। লিজি কখনো কাউকে ভালোবাসেনি। কাউকে নিয়ে ওর কোন কষ্ট হবার কথা নয়। কিন্তু এখন ওর মনে কেন জানি, এক তাল কষ্ট ছড়িয়ে যাচ্ছে। কষ্টটা আবিদের চলে যাওয়ার জন্য, না, আবিদ মিথিলাকে পেয়েও হারানোর জন্য, তা ও বুঝতে পারছে না। তবে এই প্রথম ও আবিদের জন্য কষ্ট অনুভব করছে। লিজির অজান্তে যেন ওর দু'চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নামলো। এই অশ্রুজল নায়াগ্রার জলপ্রপাতের চেয়ে কম নয়। লিজি আবিদের চিঠি হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। মিথিলার ডাকে ওর সম্বিত ফিরে আসে।

'আপনি এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যে? কোন সমস্যা হয়েছে?'

মিথিলা রহিম মিয়ার চায়ের স্টল থেকে এগিয়ে এসে লিজির পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করলো। এই প্রশ্নের জবাবে কি বলবে, ভেবে পেল না লিজি। মিথিলা লিজির মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন গলায় বললো,

‘আপনি কাঁদছেন কেন?’
এই প্রশ্নের জবাবও দিল না লিজি। ও আবিদের পত্রটা বাড়িয়ে দিল মিথিলার দিকে। বললো,
‘এটা পড়ুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।’
মিথিলা বেশ অবাক হলো। ও লিজির হাত থেকে পত্রটি নিল। পত্রটিতে চোখ রাখতেই মিথিলার বুকের ভেতরে ভীষণরকম প্রলয় হলো যেন। ওর শরীর কেঁপে উঠলো। মিথিলা রেজার হাতের লেখা চেনে। ও দ্রুত পত্রটি পড়ে নিল। ওর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। মিথিলার মনে হচ্ছিল ও এখুনিই জ্ঞান হারিয়ে ফেরবে। যাকে ও হন্যে হয়ে খুঁজছে, কিছুক্ষণ আগেও সে এখানেই ছিল। এ কথা ভাবতেই ওর ভেতর তোলপাড় শুরু হলো। চিঠি পড়ার পর মিথিলা ফ্যাকাসে মুখে লিজির দিকে তাকিয়ে বললো,
‘বলতে পারেন, রেজা কোনদিকে গেছে?’
লিজি দেখলো এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার চোখ নদী হয়ে আসছে। ও বললো,
‘পত্র পড়ে মনে হচ্ছে, আবিদ বাস স্টপিজের দিকেই গেছে। দূরে কোথাও যেতে হলে বাসই একমাত্র বাহন।’
লিজির শেষের বাক্যটি মিথিলার কানে পৌঁছুলো কিনা, বোঝ গেল না। এর আগেই ও দৌঁড়াতে লাগলো বাস স্টপিজের দিকে। মিথিলার এই দৌড় দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো চায়ের স্টলের রহিম মিয়া, গাড়োয়ান ডালিম মিয়াসহ পথচারী সকলে। কে কী ভাবছে, এ সব কথা ভাববার সময় কি মিথিলার আছে? মিথিলার দৌড়ে ছুটে চলার দিকে চেয়ে থেকে লিজি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। ও জানে, মিথিলা দৌড়ে গিয়ে আবিদ রেজাকে পাবে না। যে হারিয়ে যেতে চায়, তাকে পাওয়া যায় না। আবিদ রেজা এতোক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। লিজি মিথিলার উদভ্রান্তের মতো ছুটে চলার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার মহিমামন্ডিত এক ছবি দেখতে পেল। কিন্তু তারপরও ওর নিজের মনে এক ধরনের বিষণ্নতার সুরের লহরী টের পেল। আজ যে বিকেলটা ও মাথার ওপর নেমে আছে, এই বিকেলটাকে ভীষণ অবসাদ লাগছে। আবিদের নীরবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া এবং ওকে খুঁজে পেতে মিথিলার চেষ্টার এই মুহূর্তের যে ছবিটি ওর চোখের সামনে এক তাল বেদনায় ভেসে আছে, লিজি এর একটা নাম মনে মনে ঠিক করলো। এই নামটি হচ্ছে ‘বিষণ্ন বেহাগ’।

৯ জুলাই, ০৬
নিউইয়র্ক